বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের

সংক্ষেপিত প্রতিবেদন

ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সংক্ষেপিত প্রতিবেদন

ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের কার্যালয়
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: bangladeshjrc@gmail.com; info@jrc.gov.bd

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্যবৃন্দ

১.	**বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান** সাবেক বিচারক আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	কমিশন প্রধান
২.	**বিচারপতি মোঃ এমদাদুল হক** সাবেক বিচারক হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	সদস্য
৩.	**বিচারপতি মোঃ ফরিদ আহমদ শিবলী** সাবেক বিচারক হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	সদস্য
৪.	**মোঃ মাসদার হোসেন** সাবেক জেলা ও দায়রা জজ এবং মাসদার হোসেন মামলা'র বাদী	সদস্য
৫.	**সৈয়দ আমিনুল ইসলাম** সাবেক জেলা ও দায়রা জজ ও সাবেক রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	সদস্য
৬.	**কাজী মাহফুজুল হক সুপণ** সহযোগী অধ্যাপক আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭.	**তানিম হোসেইন শাওন** ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	সদস্য
৮.	**আরমান হোসাইন** শিক্ষার্থী আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য (শিক্ষার্থী প্রতিনিধি)

সংস্কার কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

মোহাম্মদ ফারুক, সচিব (জেলা ও দায়রা জজ), বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন ও পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা) বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

মোঃ জসিম উদ্দিন, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, গবেষণা কর্মকর্তা, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন ও সংযুক্ত কর্মকর্তা, আইন ও বিচার বিভাগ

আফসানা আবেদীন, যুগ্ম জেলা জজ, গবেষণা কর্মকর্তা, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন ও উপ-পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

মোঃ শামীম সুফী, যুগ্ম জেলা জজ, গবেষণা কর্মকর্তা, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন ও সংযুক্ত কর্মকর্তা, আইন ও বিচার বিভাগ

মোঃ আমিনুল ইসলাম, যুগ্ম জেলা জজ, গবেষণা কর্মকর্তা, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন ও রিসার্চ এন্ড রেফারেন্স অফিসার, আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

মোঃ শরিফুল ইসলাম, যুগ্ম জেলা জজ, কমিশন প্রধানের একান্ত সচিব ও সংযুক্ত কর্মকর্তা, আইন ও বিচার বিভাগ

তানিয়া ইসলাম, সিনিয়র সহকারী জজ, গবেষণা কর্মকর্তা, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন ও সংযুক্ত কর্মকর্তা, আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের

সংক্ষেপিত সংস্করণ

ভূমিকা

জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থান প্রসূত রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অক্টোবর ২০২৪ এর বিভিন্ন তারিখে আন্তবর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন মূলে গঠিত হয় বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনসহ আরো ৫টি সংস্কার কমিশন। ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের দায়িত্ব নির্ধারিত হয় একটি 'স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর বিচার বিভাগ' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন।

অর্পিত দায়িত্বের আলোকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন বিভিন্ন অংশীজনের সাথে আলোচনা, ওয়েব সাইটে প্রকাশিত প্রশ্নমালার উত্তরে প্রদত্ত মতামত ও নিজস্ব গবেষণার ভিত্তিতে ৩৫৪ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছে ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে।

সংস্কার প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের সুবিধার্থে মূল প্রতিবেদনের একটি সংক্ষেপিত সংস্করণ প্রকাশ করা আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। তদনুসারে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের মূল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই সংক্ষেপিত সংস্কারণটি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হলো।

সংক্ষেপিত সংস্করণটিতে মূল প্রতিবেদনের আলোচনা ও মতামত অংশকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করা হলেও মৌলিক সুপারিশসমূহ রয়েছে অপরিবর্তিত। প্রতিটি অধ্যায়ে কমিশনের প্রস্তাবগুলো 'সুপারিশকৃত পদক্ষেপ' শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্তকরণ প্রক্রিয়ায় মুদ্রণ প্রমাদসহ কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সেজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

বিচার বিভাগ সংস্কারের ক্ষেত্রে সংক্ষেপিত এই প্রতিবেদন সামান্য ভূমিকা রাখলেও আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

(বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান)
কমিশন প্রধান, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন
সাবেক বিচারক
আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের
সংক্ষেপিত প্রতিবেদন

সূচিপত্র

১.	*প্রথম অধ্যায়*	সূচনা	১
২.	*দ্বিতীয় অধ্যায়*	বিচার বিভাগ সংস্কারের ধারণা	২
৩.	*তৃতীয় অধ্যায়*	সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ও শৃঙ্খলা	৫
৪.	*চতুর্থ অধ্যায়*	অধস্তন আদালতের বিচারক নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি	১৪
৫.	*পঞ্চম অধ্যায়*	সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়	১৭
৬.	*ষষ্ঠ অধ্যায়*	আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ	১৯
৭.	*সপ্তম অধ্যায়*	স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস	২২
৮.	*অষ্টম অধ্যায়*	রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন	৩২
৯.	*নবম অধ্যায়*	স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস	৩৪
১০.	*দশম অধ্যায়*	বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সংবিধান-সংশোধনী	৩৯
১১.	*একাদশ অধ্যায়*	অধস্তন আদালতের সাংগঠনিক কাঠামো	৪৯
১২.	*দ্বাদশ অধ্যায়*	বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা	৫৭
১৩.	*ত্রয়োদশ অধ্যায়*	বিচার কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	৫৯
১৪.	*চর্তুদশ অধ্যায়*	অধস্তন আদালতের ভৌত অবকাঠামো	৬২
১৫.	*পঞ্চদশ অধ্যায়*	আদালত ব্যবস্থাপনা	৬৫
১৬.		প্রথম পরিচ্ছেদ: সুপ্রীম কোর্ট ব্যবস্থাপনা	৬৫
		দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অধস্তন আদালতের ব্যবস্থাপনা	৭১
	ষোড়শ অধ্যায়	বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি লাঘব	৭৭
১৭.	*সপ্তদশ অধ্যায়*	বিচার বিভাগে দুর্নীতি প্রতিরোধ	৮০
১৮.	*অষ্টাদশ অধ্যায়*	আইনগত সহায়তা কার্যক্রম	৮৪
১৯.	*ঊনবিংশ অধ্যায়*	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি	৮৮
২০.	*বিংশ অধ্যায়*	মামলাজট হ্রাস	৯৩
২১.	*একবিংশ অধ্যায়*	গ্রাম আদালত	৯৬
২২.	*দ্বাবিংশ অধ্যায়*	মোবাইল কোর্ট	৯৯
২৩.	*ত্রয়োবিংশ অধ্যায়*	আইনের সংস্কার	১০২
২৪.	*চতুর্বিংশ অধ্যায়*	বিচারক ও সহায়ক জনবলের প্রশিক্ষণ	১০৫
২৫.	*পঞ্চবিংশ অধ্যায়*	আইন পেশার সংস্কার	১০৬
২৬.	*ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়*	আইন শিক্ষার সংস্কার	১০৯
২৭.	*সপ্তবিংশ অধ্যায়*	মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রতিরোধ	১১১
২৮	*অষ্টাবিংশ অধ্যায়*	বিচারহীনতার সংস্কৃতি	১১৪
২৯.	*ঊনত্রিংশ অধ্যায়*	বিচারাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ	১১৬
৩০.	*ত্রিংশ অধ্যায়*	সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন	১১৮
৩১.	পরিশিষ্ট ১-১১ মূল প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য		

প্রথম অধ্যায়: সূচনা

১. কমিশন গঠন, দায়িত্ব ও মেয়াদ

জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম কারণ ছিল আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের কাছে জনগণের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিস্তর পার্থক্য। এই বাস্তবতায় ৩ অক্টোবর ২০২৪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি গেজেট প্রজ্ঞাপনের[১] মাধ্যমে ৮ সদস্য বিশিষ্ট বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং বিচার বিভাগকে *'স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর'* করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করার দায়িত্ব অর্পণ করে। কমিশনের কার্যকাল নির্দিষ্ট করা হয় কমিশন গঠনের তারিখ হতে ৯০ দিন। পরবর্তীতে গত ২ জানুয়ারি ২০২৫[২] এবং ২০ জানুয়ারি ২০২৫[৩] তারিখের দুইটি প্রজ্ঞাপন দ্বারা কমিশনের মেয়াদ যথাক্রমে ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

২. কমিশনের বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ

বিচার বিভাগের বহুমাত্রিক ও জটিল কার্যক্রমের প্রকৃতি এবং বাংলাদেশের বাস্তবতার আলোকে কমিশন বিচার বিভাগ সংস্কারের লক্ষ্যে বিচার বিভাগের কর্মপরিধির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি নির্ধারণ করেছে। এক্ষেত্রে বিচার বিভাগ বলতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালত ছাড়াও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিচারিক কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা প্রতিষ্ঠান এবং বিচার প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালনকারী বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা, সংবিধানে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত বিধান, সংশ্লিষ্ট আইন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, জনবল, আর্থিক এবং ভৌত ও লজিস্টিক বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এছাড়াও, সমাজে বিরোধ যাতে নিম্নতম পর্যায়ে থাকে সেরূপ মানসিকতা গঠন ও প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

৩. কমিশনের কার্যক্রম

কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে কমিশন নিয়মিত সভায় মিলিত হয়। এছাড়া দেশি-বিদেশি অংশীজন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, অন্য কয়েকটি সংস্কার কমিশনের সাথে মতবিনিময় এবং ঢাকা, রাজশাহী ও সিলেটে বৃহৎ পরিসরে তিনটি অংশীজন মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে কমিশনের প্রতিনিধিরা সিলেট ও রাজশাহীর জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন আদালত পরিদর্শন করেন। এসময় তাঁরা আদালতের অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ করেন ও বিচারপ্রার্থী জনগণ, আদালতের কর্মচারি, দায়িত্বরত পুলিশ সদস্য এবং বিচারকগণের সাথে মতবিনিময় করেন। সর্বসাধারণের মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কমিশন ওয়েবসাইটে (www.jrc.gov.bd) প্রকাশিত পাঁচটি পৃথক প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংস্কার বিষয়ে সাধারণ নাগরিক, বিচারক, সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী, অন্যান্য আইনজীবী ও আদালতের সহায়ক কর্মচারিদের মতামত সংগ্রহ করে এবং ই-মেইলের মাধ্যমে, ডাকযোগে ও কমিশনের কার্যালয়ে সরাসরি অংশীজনদের লিখিত মতামত গ্রহণ করে।

৪. প্রতিবেদন প্রস্তুতি

কমিশনের নিজস্ব গবেষণা, প্রাপ্ত মতামতের বিশ্লেষণ, কমিশনের সদস্যদের মতামত ও সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে কমিশন বিষয়-ভিত্তিক পর্যালোচনা ও সংস্কার বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাবের সমন্বয়ে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে।

---

[১] এস.আর.ও. নম্বর ৩৩১-আইন/২০২৪, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ০৩ অক্টোবর, ২০২৪

[২] এস.আর.ও. নম্বর ৫-আইন/২০২৫, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ০২ জানুয়ারি, ২০২৫

[৩] এস.আর.ও. নম্বর ৩৪-আইন/২০২৫, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ২০ জানুয়ারি, ২০২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়: বিচার বিভাগ সংস্কারের ধারণা

১. প্রশ্নবিদ্ধ বিচার বিভাগ ও বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের পরিধি

সরকার কর্তৃক প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন অনুসারে কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে 'একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর' বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব করা। স্পষ্টতই এর অর্থ হচ্ছে, উল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যের নিরিখে, দেশের বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ। সুতরাং, বিচার বিভাগ ও বিচার ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপনের লক্ষ্যে বিচার সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলোর উপর এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

২. ন্যায়বিচারের ধারণা

একটি সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজন হয় বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদানের, যার লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। বৃহত্তর আঙ্গিকে সেটা এক ধরনের সেবা। কিন্তু 'ন্যায়বিচার' (Justice) এর সর্বজনস্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা নেই। দার্শনিক ও আইনবেত্তাগণ যুগ যুগ ধরে নানাবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়বিচারকে সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে নানাবিধ সমস্যা জর্জরিত এই দেশে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের প্রধান নির্দেশিকা হবে কোনো একটি তত্ত্বভিত্তিক ন্যায়বিচার নয়, বরং মানব কল্যাণমুখী ও বাস্তবসম্মত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিচার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বিষয়গুলোর উপর প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব, যার লক্ষ্য হবে আইন অনুসারে সার্বিকভাবে মানুষের কল্যাণ সাধন এবং বাংলাদেশের বাস্তবতায় সেটা অর্জনের জন্য বিচার প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করা।

৩. মামলার উৎস

বাংলাদেশ অতিমাত্রায় ঘনবসতিপূর্ণ, স্বল্প আয়তন ও স্বল্প প্রাকৃতিক সম্পদ বিশিষ্ট একটি দেশ। এখানে বন্যা, খরা, সাইক্লোন, বন্যাজনিত ভূমিক্ষয়, ভূমিধ্বস ইত্যকার নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আবির্ভাব হয় প্রায়শই। আবার বিপুল জনসংখ্যার অধিকাংশই স্বল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং বেকার। নৈতিকতার মানদণ্ডেও এদেশের অবস্থান পেছনের সারিতে। তাই অবধারিতভাবে দেখা দেয় নানা ধরনের স্বার্থের সংঘাত, আইনের লংঘন এবং অপরাধ। এসব পরিস্থিতির কিছু অংশ আদালতে আসে মামলা আকারে বিচারপ্রাপ্তির প্রত্যাশায়। সুতরাং বলা চলে, বর্তমানে বিচারাধীন প্রায় ৪৩ লাখ মামলার উদ্ভব হয়েছে বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে। তবে এটাও অনস্বীকার্য যে, এর একটা অংশের উৎপত্তি হয় বিচার প্রক্রিয়ার দুর্বলতার কারণে। তাই বিচার বিভাগ সংস্কার প্রচেষ্টায়, যে সমস্ত কারণে মামলা সৃষ্টি হয়, সেগুলিকেও কোনো ভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না।

৪. মানবকল্যাণমুখী আইন

একটি আধুনিক ও ইপ্সিত বিচার প্রক্রিয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে মানব কল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন এবং তার সঠিক প্রয়োগ। আমাদের সংবিধান দ্বারা এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে প্রধানত সংসদের উপর। সর্বোচ্চ আইন হিসাবে সংবিধানেও মানবকল্যাণ সাধনের জন্য নানা ধরনের বিধান সন্নিবেশিত আছে। অন্যান্য অনেক আইনেও রয়েছে এর প্রতিফলন। সাধারণভাবে বলা যায়, মানবকল্যাণমুখী আইনের ঘাটতি বাংলাদেশে খুব একটা নেই। কিন্তু ঘাটতি রয়েছে এসব আইনের সঠিক অনুসরণ ও যথাযথ প্রয়োগে।

৫. প্রযোজ্য আইন অবহিতকরণের ব্যবস্থা

আইনের শাসন ও আইনানুগ বিচার প্রক্রিয়ার একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে এই যে, প্রযোজ্য আইন সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে। এই মৌলিক নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে নানাবিধ অবহিতকরণ প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়ে থাকে, যেমন- গেজেট বিজ্ঞপ্তি, পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে প্রণীত আইন, বিধি বা আইনগত দলিল প্রকাশ। এসব আইনের কপি সংগ্রহ করাও খুব একটি দুরূহ নয়।

৬. বিচারে অভিগম্যতা (Access to Justice)

এই মৌলিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্যে হচ্ছে বিচারপ্রার্থীগণ যেন সহজে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন এবং স্বল্প সময়ে ও খরচে বিচার পেতে পারেন। এই শর্তটি পূরণের জন্য আমাদের দেশে রয়েছে নানা ধরনের আদালত

ও প্রতিষ্ঠান, যেমন: গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম আদালত, থানা পর্যায়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষ, জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের আদালত, বিশেষায়িত আদালত এবং রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্ট। এছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের আধা-বিচারিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বাস্তবে অসংখ্য বিচারপ্রার্থী বিচারের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে পারেন না অথবা পারলেও সম্মুখীন হন নানাবিধ জটিলতা, হয়রানি, দীর্ঘসূত্রিতা এবং বিপুল অর্থব্যয়ের। ফলে সৃষ্টি হয় বিচার ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগোষ্ঠীর ব্যাপক অংশের অনাস্থা। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন সুপ্রীম কোর্ট ও অন্যান্য আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ এবং হয়রানি ও দীর্ঘসূত্রিতা থেকে মুক্ত একটি বিচার ব্যবস্থা।

৭. বিবাদী পক্ষ বা অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ

ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের অন্যতম মূলসূত্র হচ্ছে *Audi Alteram Partem*, যার অর্থ হচ্ছে বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে মামলার অপর পক্ষ বা অভিযুক্তকে শুনানির সুযোগ দিতে হবে। এই নীতি বাস্তবে অনুসরণের জন্য দেওয়ানি কার্যবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি, সাক্ষ্য আইনসহ অন্যান্য আইনে রয়েছে বিস্তারিত ও পর্যাপ্ত বিধান।

৮. বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, উন্মুক্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা

বিচার প্রক্রিয়ায় অবশ্যপালনীয় এই শর্তটি সম্পর্কে আমাদের দেশে প্রচলিত দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধিসহ নানাবিধ আইনে সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত বিধান আছে। সীমিত মাত্রায় সম্প্রতি যোগ হয়েছে তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে বিচার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের প্রচেষ্টা। তবে এসব আইন এবং আনুষঙ্গিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত বিচার প্রক্রিয়ার সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বিচারপ্রার্থী জনগণকে ঘুষ প্রদান এবং নানাবিধ হয়রানির শিকার হতে হয় মর্মে বিস্তর অভিযোগ আছে। সুতরাং, স্বচ্ছতা ও উন্মুক্ততা নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে প্রয়োজন দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সামগ্রিকভাবে জনগণের আস্থা অর্জন।

৯. বিচারিক সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা, ন্যায্যতা ও বৈধতা

বিচারপ্রার্থীসহ সকলের প্রত্যাশা হচ্ছে বিরোধীয় বিষয়ে যৌক্তিকতা, ন্যায্যতা ও বৈধতার ভিত্তিতে আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। আমাদের দেশের দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধি এবং অন্যান্য কিছ কিছু আইনে বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই তিনটি শর্ত পূরণের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধানও রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে উর্দ্ধতন আদালতে আপীল, রিভিশন, ইত্যাদি দায়েরের সুযোগ। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিদ্যমান আইনের এতসব বিধান সত্ত্বেও মামলার দীর্ঘসূত্রিতা, যথাযথ সাক্ষ্যের অভাব এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনজীবী ও বিচারকের দক্ষতার অভাবের ফলে মানুষের সুবিচার প্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

১০. বিচারকের স্বাধীনতা

সামগ্রিকভাবে বিচার বিভাগ অথবা কোনো নির্দিষ্ট বিচারকের স্বাধীনতা নির্ভর করে প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর, যথা: ১. প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, ২. আর্থিক স্বাধীনতা এবং ৩. বিচারকের চাকরিকালের নিশ্চয়তা। বিচারকের স্বাধীনতার নীতিটি আমাদের সংবিধানের ৯৪(৪) এবং ১১৬ক অনুচ্ছেদে ঘোষিত হয়েছে। এই ঘোষণার আংশিক প্রতিফলন দেখা যায় সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে। অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে ৯৫(১) অনুচ্ছেদে রয়েছে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণের বিধান। বিচারপতিদের শৃঙ্খলা ও অপসারণ ইত্যাদি বিষয়ে ৯৬ অনুচ্ছেদেও রয়েছে প্রায় অনুরূপ বিধান। অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে মূল ক্ষমতা নির্বাহি কর্তৃপক্ষের, তবে তার সাথে যুক্ত আছে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা। অর্থাৎ, এসব ক্ষেত্রে রয়েছে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, যার অবসান হওয়া প্রয়োজন।

১১. বিচারকের নিরপেক্ষতা, দক্ষতা ও সততা

বাংলাদেশের বাস্তবতায় বিচারকদের ব্যক্তিগত নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বিভিন্ন আইন, যেমন সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদ, বিচারকদের শপথ, সিভিল কোর্টস এ্যাক্ট ১৮৮৭ এর ৩৮ ধারা, ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৫৬ ধারা ইত্যাদি বিধানে বিচারকদের নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধান আছে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা না হলে এসব বিধানের অর্থবহ প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না। অনেক বিচারকের দক্ষতা ও সততাও প্রশ্নের

ঊর্ধ্বে নয়। সুতরাং, বিচার ব্যবস্থার এ সকল অপরিহার্য বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবমুখী আইন-কানুনসহ আনুষঙ্গিক সংস্কার প্রয়োজন।

১২. বিচার বিভাগের সামগ্রিক কার্যকরতা

বিচার বিভাগের সামগ্রিক কার্যকরতা অনেকাংশে নির্ভর করে আর্থিক স্বাধীনতা, অবকাঠামো, সরঞ্জামাদি, সহায়ক জনবল ইত্যাদি প্রাপ্তির উপর। আবার বিচারিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন হয় নির্বাহী বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের সহায়তা। এ বিষয়গুলো মূলত সরকারের নির্বাহী বিভাগ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

বিচারিক কার্যক্রমের কার্যকরতার ক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তি ভূমিকা পালন করে থাকেন, তাঁরা হলেন: (ক) বিচারক; (খ) আইনজীবী; (গ) সরকারি আইন কর্মকর্তা; (ঘ) বিভিন্ন তদন্ত সংস্থা; (ঙ) আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারি; (চ) মামলার পক্ষগণ; ও (ছ) সাক্ষী। তাছাড়াও বিচারিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য অবধারিত ভাবে প্রয়োজন হয় সরকারের নির্বাহি বিভাগের সহায়তা। বিচার প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী এসব ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের সুসমন্বিত ও কার্যকর ভূমিকা যথাসম্ভব নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে অন্যান্য অধ্যায়ে।

১৩. আইন সংস্কার ও বাস্তব পদক্ষেপ

বিচার বিভাগ সংস্কার বিষয়ে বিভিন্ন শিরোনামে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো এই প্রতিবেদনের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনাসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ও আনুষঙ্গিক সংস্কার এর প্রস্তাব করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ ও শৃঙ্খলা

১. ভূমিকা: প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে বিচারকদের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত। একই সাথে, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে এর জবাবদিহিতা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা আবশ্যক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যমান ব্যবস্থার অর্থবহ সংস্কার করা প্রয়োজন।

২. প্রধান বিচারপতি নিয়োগ: বিদ্যমান সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কারো পরামর্শ ব্যতিরেকে রাষ্ট্রপতি নিজস্ব প্রজ্ঞা অনুসারে এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু অতীতে বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিষয়ে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে মর্মে অভিযোগ আছে। কমিশন মনে করে যে, বিচার বিভাগের উপর জনগণের আস্থা বজায় রাখার জন্য প্রধান বিচারপতির নিয়োগকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত রাখার লক্ষ্যে সংবিধানে এই মর্মে বিধান থাকা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককেই প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:** সংবিধানের ৪৮(৩), ৫৫(২) এবং ৯৫(১) অনুচ্ছেদ সংশোধন।[৪]

৩. সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের সংখ্যা নির্ধারণ: আপীল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগে বিচারকের সংখ্যা নির্ধারণে প্রধান বিচারপতির কর্তৃত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যমান মামলাজট থেকে উত্তরণ এবং একটি যৌক্তিক সময়ের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার জন্য আপীল বিভাগে সকল সময় দুই বা ততোধিক বেঞ্চ পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের ৯৪(২) অনুচ্ছেদ নিম্নরূপে সংশোধন করার প্রস্তাব করছে:

(ক) আপীল বিভাগের ন্যূনতম বিচারক সংখ্যা হবে ৭ (সাত) জন; এবং প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক সময়ে সময়ে আরো অধিক সংখ্যক বিচারক নিয়োগ করা হবে;

(খ) প্রধান বিচারপতির চাহিদা মোতাবেক হাইকোর্ট বিভাগে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়োগ করা হবে।

৪. প্রধান বিচারপতি ব্যতীত অন্যান্য বিচারক নিয়োগের জন্য পৃথক কমিশন গঠন

সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত প্রধান বিচারপতির একক পরামর্শ প্রদান পদ্ধতির পরিবর্তে একটি সম্মিলিত এবং প্রতিনিধিত্বশীল সুপারিশ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা যৌক্তিক এবং বাঞ্ছনীয় বলে কমিশন মনে করে। সেই লক্ষ্যে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট "সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন" নামে একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক (অর্থাৎ, হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক ও স্থায়ী বিচারক এবং আপীল বিভাগের বিচারক) নিয়োগে কমিশনের মতামতই প্রাধান্য পাবে। এই কমিশনের গঠন হবে নিম্নরূপ:

<u>কমিশন প্রধান</u>
বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি

<u>সদস্য (আটজন)</u>
(ক) আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম ২ (দুই) জন বিচারক;
(খ) হাইকোর্ট বিভাগের কর্মে প্রবীণতম ২ (দুই) জন বিচারক (যার মধ্যে একজন হবেন বিচার-কর্মবিভাগের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন);

[৪] দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

(গ) উপরিউক্ত ৪ (চার) বিচারক-সদস্যের সাথে পরামর্শক্রমে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক তিন বছরের জন্য মনোনীত একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অথবা সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;

(ঘ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল;

(ঙ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি;

(চ) ক্রমিক (১) ও (২) এ উল্লিখিত ৪ (চার) বিচারক-সদস্যের সাথে পরামর্শক্রমে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক তিন বছরের জন্য মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের একজন আইনজীবী।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:** আপীল বিভাগের বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত ও স্থায়ী বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও সততা নিশ্চিতকরণের জন্য যথাযথ পদ্ধতিসহ আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে সংবিধানে একটি নতুন অনুচ্ছেদ ৯৫ক সংযুক্ত করতে হবে[৫]।

৫. নিয়োগের যোগ্যতা: বর্তমানে সংবিধানের ৯৫(২) অনুচ্ছেদে কোনো ব্যক্তিকে সুপ্রীম কোর্টে বিচারক হিসাবে নিয়োগের জন্য যোগ্যতার যে শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

বিদ্যমান সংবিধানের ৯৫(২) অনুচ্ছেদের বিধান:

(ক) তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং

(খ) সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন ১০ (দশ) বছর এ্যাডভোকেট হিসাবে থাকতে হবে, **অথবা** বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অন্যূন ১০ (দশ) বছর কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকতে হবে, **অথবা** আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত অন্য কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।

উল্লেখ্য যে,, সর্বশেষে উল্লিখিত শ্রেণির ব্যক্তিদের যোগ্যতা সংক্রান্ত কোন আইন এখন পর্যন্ত প্রণীত হয়নি। সার্বিক বিবেচনায় সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিম্নরূপ:

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:**

(ক) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে একজন প্রার্থী অবশ্যই শুধুমাত্র বাংলাদেশের নাগরিক হবেন। যদি তিনি অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন বা অন্য কোন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন তবে তাঁর বিচারক হওয়ার বা বিচারক পদে থাকার যোগ্যতা থাকবে না।

(খ) হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারক হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীর বয়স হতে হবে অন্যূন ৪৮ (আটচল্লিশ) বছর। ন্যূনতম বয়স নির্ধারনের আলোকে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকদের অবসরের বয়সসীমা ৭০ (সত্তর) বছর করার জন্য কমিশন প্রস্তাব করছে। তবে, অবসরের নতুন এই বয়সসীমা প্রস্তাবিত সংশোধনীর আগে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(গ) উক্তরূপ প্রার্থীর অবশ্যই নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকবে:

(অ) সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে অন্যূন ১৫ (পনের) বছরের সক্রিয় আইন পেশার অভিজ্ঞতা (কেবল আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্তিই যথেষ্ট নয়); অথবা

(আ) জেলা জজ হিসেবে অন্যূন ৩ (তিন) বছর বিচার বিভাগীয় পদে চাকরিসহ বিচার বিভাগে অন্যূন ১৫ (পনের) বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা; অথবা

[৫] দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

(ই) যদি সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে[৬] ভবিষ্যতে একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে উক্ত সার্ভিসে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে অন্যূন ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ অ্যাটর্নি সাভিসে অন্যূন ১৫ (পনের) বছরের অভিজ্ঞতা [৭]।

মন্তব্য: ক্রান্তিকালীন পর্যায়ে (অর্থাৎ, স্থায়ী অ্যাটর্নি সাভিসে সর্বপ্রথম নিয়োগের ১৫ (পনের) বছর পূর্তির পূর্ব পর্যন্ত) উক্ত সার্ভিসের কোন প্রার্থী বিচারক হওয়ার যোগ্য হবেন যদি তাঁর সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে অভিজ্ঞতা এবং অ্যাটর্নি সার্ভিসে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে অভিজ্ঞতার মোট সময়কাল অন্যূন ১৫ (পনের) বছর হয়।

৬. হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ: এ বিষয়ে বংলাদেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা, জনগণের প্রত্যাশা, কমনওয়েলথ লাটিমার হাউজ নীতিমালা এবং কমনওয়েলথ সচিবালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত বেস্ট প্র্যাকটিস ২০১৫ এর আলোকে কমিশন হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণের প্রস্তাব করছে, যথা:

(ক) ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ নিয়োগ কমিশন নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে।

(খ) নিয়োগ কমিশন যোগ্য প্রার্থীদের আবেদন করার আহ্বান করবে। কমিশন তৃতীয় পক্ষ থেকেও যোগ্যতাসম্পন্ন কোন নির্দিষ্ট প্রার্থীর মনোনয়ন আহ্বান করতে পারবে। তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রার্থীর লিখিত সম্মতি সংযুক্ত করতে হবে।

(গ) অতিরিক্ত বিচারক পদে আবেদন বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে তপশিল "ক" -তে বর্ণিত তথ্য ও দলিল সংযুক্ত করতে হবে। প্রার্থীর নাগরিকত্ব সংক্রান্ত তথ্যাদি, শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা এবং দক্ষতা, আর্থিক অবস্থান ও আনুষঙ্গিক তথ্যাদি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(ঘ) আবেদনের সাথে সংযুক্ত তথ্য ও দলিলপত্র পর্যালোচনার ভিত্তিতে নিয়োগ কমিশন প্রার্থীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করবে।

(ঙ) সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের নাম ও তথ্যাদি জনসাধারণের কছে প্রকাশ করা হবে যাতে জনগণ কোন প্রার্থীর উপযুক্ততা বিষয়ে আপত্তি থাকলে তা কমিশনের নিকট তথ্য-প্রমাণসহ প্রেরণ করতে পারে।

(চ) সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীগণকে কমিশনের সামনে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাতকারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে নেতিবাচক তথ্য বা আপত্তি দাখিল হয়ে থাকলে সে বিষয়ে প্রার্থীর বক্তব্য এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ দেয়া হবে।

(ছ) নিয়োগ কমিশন উপরিউক্ত প্রক্রিয়া শেষে প্রার্থীর শ্রেণিভেদে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করবে-

(অ) সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট হিসাবে ন্যূনতম যোগ্যতাসহ একজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত কাজের মানসহ দক্ষতা, সামগ্রিক বাস্তব অভিজ্ঞতা, সততা, সুনাম এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি;

(আ) বিচার-কর্মবিভাগের সদস্য হিসাবে ন্যূনতম যোগ্যতাসহ একজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিচারিক আদেশ ও সিদ্ধান্তের গুণগতমান, আদালত ব্যবস্থাপনা, উক্ত কর্মবিভাগে জ্যেষ্ঠতা, সততা, সুনাম এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি;

(ই) (যখন প্রযোজ্য)[৮] অ্যাটর্নি সার্ভিসের সদস্য হিসাবে ন্যূনতম যোগ্যতাসহ একজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত কাজের মানসহ দক্ষতা, সামগ্রিক বাস্তব অভিজ্ঞতা, সততা, সুনাম এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি।

(জ) কমিশন নিজেদের মধ্যে আলোচনা শেষে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করবে, এবং নিয়োগযোগ্য বিচারকের সংখ্যার অতিরিক্ত ০২ (দুই) জন প্রার্থীর নামসহ চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন

[৬] সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

[৭] এই বিষয়ে তিনজন কমিশন-সদস্যের ভিন্নমতের জন্য পরিশিষ্ট ৬ দেখুন।

[৮] এ বিষয়ে কমিশনের তিন সদস্যের ভিন্নমতের জন্য পরিশিষ্ট ৬ দেখুন।

করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবে। কমিশন কর্তৃক প্রণীত সুপারিশে উল্লিখিত শ্রেণিগুলোর যুক্তিসঙ্গত প্রতিনিধিত্ব প্রতিফলিত হতে হবে।

(ঝ) কমিশনের সুপারিশ পাওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিচারক(দের) নিয়োগ দান করবেন। রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র একবার লিখিতভাবে কারণ উল্লেখক্রমে সুপারিশ পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনের কাছে ফেরত পাঠাতে পারবেন। পুনর্বিবেচনার পরে কমিশন পরিবর্তিত সুপারিশ অথবা, পূর্বের সুপারিশ অপরিবর্তিতরূপে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে।

(ঞ) রাষ্ট্রপতি তাঁর কছে দ্বিতীয়বার প্রেরিত সুপারিশ উপস্থাপনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সুপারিশ অনুযায়ী বিচারক(দের) নিয়োগ দান করবেন।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:** উল্লিখিত প্রক্রিয়া প্রবর্তনের জন্য এবং নিয়োগ কমিশনের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংবিধানে যথাযথ বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করতে হবে এবং কমিশনকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেদন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান থাকাকালে একটি অন্তবর্তী প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে সরকারে বিদ্যমান সংবিধানের অধীনে ২১ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. তারিখে একটি অধ্যাদেশ প্রণয়ন করে।

৭. হাইকোর্ট বিভাগে স্থায়ী বিচারক নিয়োগ

৭.১ এক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত পরিহারের লক্ষ্যে কমিশনের কার্যক্রমে অ্যাটর্নি জেনারেল, সুপ্রীম কোর্ট বার এসাসিয়েশনের সভাপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী-সদস্য অংশগ্রহণ করা হতে বিরত থাকবেন। ফলে নিয়োগ কমিশন হবে ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট।

৭.২ একজন অতিরিক্ত বিচারকের মেয়াদপূর্তির অন্যূন ০২ (দুই) মাস পূর্বে, নিয়োগ কমিশন উক্ত বিচারকের নিয়োগযোগ্যতা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু করবে। এক্ষেত্রে কমিশন অতিরিক্ত বিচারক হিসাবে তাঁর নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা, বিচারিক আদেশ ও সিদ্ধান্তের গুণগতমান, আদালত ব্যবস্থাপনা, সার্বিক দক্ষতা, সততা, আচরণ ও সুনামসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করবে।

৭.৩ নিয়োগ কমিশন একজন অতিরিক্ত বিচারককে সাক্ষাতকারের জন্য উপস্থিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

৭.৪ মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে কমিশন একজন অতিরিক্ত বিচারককে স্থায়ী বিচারক হিসেবে নিয়োগ দানের সুপারিশ অথবা তাঁর নিয়োগের পরিসমাপ্তি ঘটানো অথবা অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে তাঁর কার্যকাল অনধিক ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধির সুপারিশ করতে পারবে। এক্ষেত্রে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা শেষে সদস্যদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপরি-উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৬ এর দফা (ঝ) ও (ঞ) তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:** উল্লিখিত প্রক্রিয়া প্রবর্তনের জন্য এবং নিয়োগ কমিশনের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংবিধানে যথাযথ বিধান (অনুচ্ছেদ ৯৫ক) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে[৯], প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করতে হবে এবং কমিশনকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

৮. আপিল বিভাগে বিচারক নিয়োগ

৮.১ এক্ষেত্রে নিয়োগ কমিশনের কার্যক্রমে স্বার্থের সংঘাত পরিহারের লক্ষ্যে হাইকোর্ট বিভাগের দুইজন বিচারক-সদস্য, অ্যাটর্নি জেনারেল, সুপ্রীম কোর্ট বার এসাসিয়েশনের সভাপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী-সদস্য অংশগ্রহণ করা হতে বিরত থাকবেন । ফলে কমিশন হবে ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট।

৮.২ আপীল বিভাগে বিচারকের শূন্যপদে নিয়োগের জন্য কমিশন প্রাথমিকভাবে হাইকোর্ট বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারকদের ক্রমানুসারে বিবেচনা করবেন । শুধুমাত্র দায়িত্বপালন, কর্মদক্ষতা এবং সার্বিক আচরণের প্রশ্নে জোরালো নেতিবাচক কারণ থাকলেই কমিশন জ্যেষ্ঠতার নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাতে পারবে।

[৯] দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

৮.৩ আপীল বিভাগের বিচারক হিসাবে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকের নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা, বিচারিক আদেশ ও সিদ্ধান্তের গুণগতমান, আদালত ব্যবস্থাপনা, সার্বিক দক্ষতা, সততা, আচরণ ও সুনামসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করবে।
৮.৪ নিয়োগ কমিশন একজন বিচারককে সাক্ষাতকারের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে।
৮.৫ উপরিউক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণের পর নিজেদের মধ্যে আলোচনা শেষে সদস্যদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ ৬ এর দফা (ঝ) ও (ঞ) তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।
****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:** উল্লিখিত প্রক্রিয়া প্রবর্তনের জন্য এবং নিয়োগ কমিশনের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংবিধানে একটি নতুন বিধান (অনুচ্ছেদ ৯৫ক) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করতে হবে এবং কমিশনকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

৯. অন্তবর্তীকালীন অধ্যাদেশ প্রণয়ন: সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন। তবে, বিদ্যমান সংবিধানের অধীনেই বিচারক নিয়োগের জন্য একটি কমিশন গঠন করার মাধ্যমে প্রস্তাবিত সংস্কারের উল্লেখযোগ্য অংশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এই প্রেক্ষাপটে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অনুরোধে, সংস্কার কমিশন তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার আগেই সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন প্রতিষ্ঠা ও তার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে একটি খসড়া অধ্যাদেশ প্রস্তুত করে, এবং গত ১৯ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে খসড়াটি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার কাছে প্রেরণ করে। খসড়া অধ্যাদেশটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। । উল্লেখ্য যে, প্রেরিত খসড়ার ভিত্তিতে গত ২১ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. তারিখে একটি অধ্যাদেশ প্রণীত ও জারি করা হয়েছে।

১০. সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের সংস্কার
১০.১ প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারকদের শৃঙ্খলা বিধান ও অপসারণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দুইটি মূলনীতি অনুসরণ করা অপরিহার্য:

(ক) কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির চাপে বা নির্বাহী বিভাগের খেয়াল-খুশিমতো বিচারকদের অপসারণ করা যাবে না, এবং শুধুমাত্র অসামর্থ্য বা গুরুতর অসদাচরণের কারণেই বিচারকদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেয়া যাবে বা তাঁদেরকে অপসারণ করা যাবে;

(খ) উপযুক্ত আইনী কাঠামোর মধ্যে বিচারকদের জবাবদিহিতার আওতায় রাখতে হবে, যেন তাঁরা নিজেদেরকে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে মনে না করেন।

এক্ষেত্রে "গুরুতর অসদাচরণ" বলতে এমন অসদাচরণকে বুঝাবে যার ফলে একজন বিচারক তার পদে থাকার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

১০.২ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ষোড়শ সংশোধনী মামলার[১০] রায়ের মাধ্যমে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীকে বাতিল ঘোষণা করে। এর ফলে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনঃপ্রবর্তিত সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল সংক্রান্ত ৯৬ অনুচ্ছেদটি পুনরায় বলবৎ হয়। গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ হাইকোর্ট বিভাগ পঞ্চদশ সংশোধনী মামলার[১১] রায়ে পঞ্চদশ সংশোধনীর কিছু বিধান সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী বলে বাতিল করলেও, ওই সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত ৯৬ অনুচ্ছেদকে বাতিল ঘোষণা করেনি। সুতরাং, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল সংক্রান্ত ৯৬ অনুচ্ছেদ বর্তমানে কার্যকর রয়েছে।

---

[১০] *বাংলাদেশ সরকার* বনাম *এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান সিদ্দিকী ও অন্যান্য* [৭১ ডি এল আর (এডি) ৫২]
[১১] *ড. বদিউল আলম মজুমদার ও অন্যান্য* বনাম *বাংলাদেশ ও অন্যান্য*, রিট পিটিশন নং ৯৯৩৫/২০২৪ (এ যাবত আনুষ্ঠানিক রায় প্রকাশিত হয়নি, তবে রায়ের বিষয়বস্তু ডেইলি স্টারসহ অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।)

১০.৩ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬(৩) অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতি এবং তাঁর পরবর্তী কর্মে প্রবীণ ০২ (দুই) জন বিচারক সমন্বয়ে "সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল" গঠিত হবে। উপ-অনুচ্ছেদ (৩)-এর শর্তাংশে বলা হয়েছে যে, উপরিউক্ত তিনজন পদাধিকারীর কোন একজনের বিরুদ্ধে যদি কাউন্সিল তদন্ত করে বা কেউ যদি অনুপস্থিত থাকেন বা দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, তাহলে কাউন্সিলের যারা সদস্য আছেন তাঁদের পরবর্তী যে বিচারক কর্মে প্রবীণ তাঁকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

১০.৪ এক্ষেত্রে ষোড়শ সংশোধনী মামলায় বিচারপতি ইমান আলী কর্তৃক প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ প্রনিধাণযোগ্য। তিনি তাঁর মতামতে উল্লেখ করেন যে, কোনো বিভাগীয় তদন্তের নীতি হলো, যাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে তাঁর চেয়ে উর্দ্ধতন কোন ব্যক্তি তদন্তের দায়িত্বে থাকবেন। এই নীতি অনুযায়ী প্রস্তাব করা হয় যে, দায়িত্বরত প্রধান বিচারপতি বা সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের অন্য কোনো বিচারক-সদস্য যদি তদন্তের বিষয়বস্তু হন, তাহলে রাষ্ট্রপতি অবসরপ্রাপ্ত কোন প্রধান বিচারপতি বা আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কোন বিচারককে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে কাউন্সিল গঠন করবেন।

১০.৫ উপরিউক্ত প্রস্তাব এই কারণে বিবেচনার দাবি রাখে যে, কোনো বিচারকের পক্ষে তাঁর ঊর্ধ্বতন বা তাঁর থেকে প্রবীণ কোন বিচারকের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন থাকা দুরূহ। পক্ষান্তরে, একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বা আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের ক্ষেত্রে অনুরূপ সীমাবদ্ধতা থাকার সম্ভাবনা কম। ফলে, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের গঠন সম্পর্কে এই মর্মে বিধান করা যেতে পারে যে, কাউন্সিল যদি কোন সময়ে প্রধান বিচারপতির সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অথবা আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারক তদন্তের বিষয়ে "সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলে প্রধান বিচারপতির স্থলাভিষিক্ত হবেন। তবে, কাউন্সিলের অন্য কোন বিচারক-সদস্যের বিষয়ে তদন্তের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি যেহেতু কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন, সেহেতু ওই ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত কোন বিচারককে কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য নয় বলে কমিশন মনে করে। অর্থাৎ, এই ধরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৯৬ অনুচ্ছেদের শর্তাংশ অনুযায়ী কাউন্সিলের গঠন বহাল রাখা যায়।

১০.৬ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬(৪)(ক) অনুযায়ী, সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের অন্যতম দায়িত্ব হলো সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি নির্ধারণ করা। ষোড়শ সংশোধনী মামলার রায়ে এবং তার পূর্বে *মোঃ ইদ্রিসুর রহমান* বনাম *বাংলাদেশ* মামলার[১২] রায়ে আপীল বিভাগ পর্যবেক্ষণ আকারে বিচারকদের জন্য আচরণবিধি ঘোষণা করেন। তবে তা অনুচ্ছেদ ৯৬(৪)(ক)-এর অধীনে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের ঘোষিত আচরণবিধি কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এই বিতর্ক এড়ানোর লক্ষ্যে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের সভায় বিচারকদের জন্য আচরণবিধি নির্ধারণ করে একটি পৃথক দলিল তৈরি ও ঘোষণা আকারে তা প্রকাশ করা উচিৎ। আচারণবিধি সময়ে সময়ে হালনাগাদ করার জন্যও একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া থাকা বাঞ্ছনীয়।

১০.৭ যেহেতু সুপ্রীম কের্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকরা তাঁদের নামের আগে "বিচারপতি" পদবি ব্যবহার করেন এবং রাষ্ট্রের অর্থায়নে বিভিন্ন সুবিধাও ভোগ করেন, সেহেতু তাদের জন্য পালনীয় একটি আলাদা আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা প্রয়োজন, যেন অবসরোত্তর সময়ে তাঁদের কোন আচরণের ফলে জনমানসে বিচারক থাকাকালে তাঁর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য বিচারকদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি না হয়। উক্ত আচরণবিধি ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে তাঁদেরকে সতর্ক করা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে "বিচারপতি" পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করার বিধান থাকা প্রয়োজন।

১০.৮ অনুচ্ছেদ ৯৬(৪)(খ)-তে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের জন্য প্রযোজ্য পদ্ধতি ছাড়া অপসারণযোগ্য নন এমন পদে আসীন ব্যক্তিদের সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্তের দায়িত্বও সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং, উক্ত শ্রেণির ব্যক্তিবর্গের জন্য পালনীয় আচরণবিধিও কাউন্সিল কর্তৃক প্রণয়ন ও প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।

[১২] ১৩ এ.ডি.সি. ২২০

১০.৯ বিদ্যমান সংবিধানের ৯৬(৫) এবং ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ এর আইনগত ফলাফল এই যে, সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল সাধারণত স্বউদ্যোগে নয় বরং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুসারে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করতে পারে। এ বিষয়ে নানা ধরনের আলোচনা-সমালোচনা রয়েছে। বাস্তবে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলকে এ যাবত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:**

উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় সংস্কার কমিশন মনে করে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং যথাযথ কার্যপদ্ধতি প্রণয়নের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন:

(ক) সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল আনুষ্ঠানিকভাবে বিচারকদের পালনীয় আচরণবিধি প্রকাশ করবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর তা পর্যালোচনা করবে ও প্রয়োজন মনে করলে তা হালনাগাদ করবে। অনুরূপভাবে, সাবেক বিচারপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি ছাড়া অপসারণযোগ্য নন এমন পদে আসীন ব্যক্তিদের জন্য পালনীয় আলাদা আলাদা আচরণবিধিও কাউন্সিল প্রণয়ন ও প্রকাশ করবে।

(খ) কোন বিচারকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত করার বিষয়ে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল রাষ্ট্রপতি, তথা নির্বাহী বিভাগের, নির্দেশের পরিবর্তে নিজ সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে, এবং রাষ্ট্রপতিকে সে বিষয়ে অবহিত করবে। তবে, রাষ্ট্রপতি যদি এমন তথ্য পান যার ভিত্তিতে কোন বিচারকের বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া আবশ্যক বলে তিনি মনে করেন, তাহলে তিনি কাউন্সিলকে তদন্ত পরিচালনার জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন। তদন্তের উদ্দেশ্যে কাউন্সিল নিজস্ব কার্য-পদ্ধতি নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে বিধি প্রণয়ন করবে এবং পরোয়ানা জারি ও নির্বাহের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের অনুরূপ কাউন্সিলের একই ক্ষমতা থাকবে[১৩]।

(গ) সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল বিচারকদের বিচারিক দক্ষতা, আদালত ব্যবস্থাপনা, মামলা ব্যবস্থাপনা, আইনজীবী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আচরণসহ তাদের সার্বিক আচরণ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য একটি চলমান প্রক্রিয়া বজায় রাখবে, এবং তার অংশ হিসাবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সময়ে সময়ে মতবিনিময় করবে।

(ঘ) প্রতি তিন বছর পরপর, এবং সর্বশেষে অবসর গ্রহণের ৬ (ছয়) মাস আগে, বিচারকদের ও তাঁদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের সম্পদের বিবরণ সংগ্রহ করে কাউন্সিল তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে ও প্রকাশ করবে।

(ঙ) বিচারপ্রার্থী, আইনজীবী, আদালতের সহায়ক কর্মচারি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যেন বিচারকদের ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ কাউন্সিলকে জানাতে পারেন সেজন্য কাউন্সিল একটি স্থায়ী অভিযোগ-গ্রহণ প্রক্রিয়া সচল রাখবে। কাউন্সিল একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রাপ্ত অভিযোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত পরিচালনা করবে। বিষয়টি কাউন্সিলের কার্যবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(চ) কাউন্সিল বিচারকদের অপসারণের মতো চূড়ান্ত ব্যবস্থা ছাড়াও কোন বিচারকের নির্দিষ্ট কোনো আচরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদারকি, পরামর্শ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এ সংক্রান্ত যথাযথ বিধান আচরণবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(ছ) উপরিউক্ত দফা (খ) থেকে (চ) পর্যন্ত বর্ণিত কার্যক্রম সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি ছাড়া অপসারণযোগ্য নন এমন পদে আসীন ব্যক্তিদের জন্যও, যতটুকু প্রাসঙ্গিক ততটুকু, প্রযোজ্য হবে।

[১৩] দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

(জ) তদন্তে কোনো সাবেক বিচারকের বিরুদ্ধে তাঁর জন্য পালনীয় আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয় প্রমাণিত হলে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে সতর্ক করা এবং যথাযথ ক্ষেত্রে "বিচারপতি" পদবি ব্যবহার থেকে বারিত করা হবে ।

তপশিল

হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক হিসাবে নিয়োগের আবেদনপত্র এর ফরম

(ক) আবেদনকারীর ব্যক্তিগত, শিক্ষাগত ও অনুষঙ্গিক তথ্যাদি

১. আবেদনকারীর নাম
২. নাগরিকত্ব
৩. জন্ম তারিখ (জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি সংযুক্ত করতে হবে)
৪. শিক্ষাগত যোগ্যতা (এসএসসি/সমমান ও উচ্চতর, যাতে কোনো স্বীকৃতি, বৃত্তি, ফেলোশিপ বা অন্য কোনা অর্জনেরও (প্রযোজ্য হলে) উল্লেখ থাকবে)
৫. পেশাগত প্রশিক্ষণ, যদি থাকে
৬. পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যপদ, যদি থাকে
৭. কোনো ক্লাব বা অনুরূপ কোনো সংগঠনের কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকলে তার তথ্য
৮. কোনো মামলা (তদন্ত চলমান এমন মামলাসহ) বা আদালত অবমাননার মামলায় পক্ষ হয়ে থাকলে, মামলার ফলাফলসহ অনুষঙ্গিক তথ্য
৯. ইতোপূর্বে কোনো প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ বা খণ্ডকালীন চাকরি করে থাকলে সে বিষয়ে তথ্য
১০. কোনো গুরুতর ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকলে তার বিবরণ (যেমন ক্যান্সার বা হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, কিডনী, যকৃত, অগ্নাশয়, স্নায়বিক ও দৃষ্টিশক্তি সংক্রান্ত কোনো অসুস্থতা)
১১. গত তিন বছরের আয়কর রিটার্নের অনুলিপি

(খ) আবেদনকারীর পরিবারের সদস্যদের তথ্যাদি

১২. আবেদনকারীর স্বামী/স্ত্রী'র নাম ও ঠিকানা
১৩. স্বামী/স্ত্রী'র পেশা
১৪. আবেদনকারীর সন্তানদের নাম ও ঠিকানা
১৫. আবেদনকারীর সন্তানদের পেশা
১৬. **আবেদনকারী এ্যাডভোকেট হলে**
   (অ) এ্যাডভোকেট হিসাবে, হাইকোর্ট বিভাগে এবং আপীল বিভাগে (যদি প্রযোজ্য হয়) তালিকাভুক্তির তারিখ
   (আ) কোনো সময়ে সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিস- এ বিরতি থাকলে তার সময়কাল ও বিবরণ
   (ই) এ্যাডভোকেট হিসাবে আইনের নির্দিষ্ট কোনো শাখায় আবেদনকারীর বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকলে তার বিবরণ
   (ঈ) এ্যাডভোকেট হিসাবে সুপ্রীম কোর্টে আইনগত যুক্তিতর্ক উপস্থাপনসহ পরিচালনা করেছেন এমন ২০ (বিশ) টি মামলার তালিকা (রায়ের অনুলিপিসহ)
   (উ) আবেদনকারীর প্রস্তুতকৃত ও সুপ্রীম কোর্টের মামলায় দাখিলকৃত ১০ (দশ)টি আইনগত দলিল যেমন, রিট পিটিশন, ফৌজদারি আপীল ও ফৌজদারি রিভিশন, দেওয়ানি রিভিশন এবং আদি ও অন্যান্য এখতিয়ারের প্রযোজ্য মামলার মূল আবেদনপত্র বা আরজি, ইত্যাদি
   (ঊ) কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকলে তার বিবরণ
   (ঋ) আবেদনকারী কোনো নির্বাচনে অংশ গ্রহণ বা নির্বাচিত কোনো পদে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকলে তার বিবরণ

(এ) আবেদনকারী বংলাদেশ বার কাউন্সিলের বা আইনজীবী সমিতির কোনো পদে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকলে তার বিবরণ

(ঐ) বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে পেশাগত অসদাচারণ বিষয়ক কোনো কার্যধারায় অভিযুক্ত হয়ে থাকলে তার বিবরণ (ফলাফলসহ)

১৭. আবেদনকারী বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকলে

(অ) বিচার-কর্মবিভাগে যোগদানের তারিখ

(আ) গত দশ বছর আবেদনকারী যে সকল পদে কর্মরত ছিলেন তার বিবরণ

(ই) আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনো বিভাগীয় মামলা সূচিত হয়ে থাকলে তার বিবরণ (অভিযোগের ধরন এবং ফলাফলসহ)

(ঈ) আবেদনকারী কর্তৃক দোতরফা সূত্রে নিষ্পত্তিকৃত পাঁচটি ফৌজদারি এবং পাঁচটি দেওয়ানি মামলার তালিকা (রায়ের অনুলিপিসহ)

চতুর্থ অধ্যায়: অধস্তন আদালতের বিচারক নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি

১. ভূমিকা

বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাবলি সংক্রান্ত বিষয়াবলি সংবিধানের ১১৫ এবং ১১৬ অনুচ্ছেদে বিধৃত হয়েছে। সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদ দুটি এবং অন্যান্য অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে মাসদার হোসেন মামলায়[১৪] সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ১২ দফা নির্দেশনা প্রদান করে। সেই সকল নির্দেশনার আলোকে রাষ্ট্রপতি ৫টি বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন ও জারি করেন, যথা: (১) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস গঠন, সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ, ইত্যাদি, (২) কর্মস্থল নির্ধারণ ও চাকুরির অন্যান্য শর্তাবলি, (৩) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন, ইত্যাদি, (৪) সার্ভিসের শৃঙ্খলা এবং (৫) সার্ভিস সদস্যদের জন্য পে কমিশন।

উল্লিখিত ৫টি বিধিমালা অনুসারে অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলির প্রকৃতি মূলত প্রশাসনিক। এসব বিধিমালা অনুযায়ী সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের পর বিচারকগণ একটি দ্বৈত প্রশাসন ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হন। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি তথা নির্বাহি বিভাগের পক্ষে আইন মন্ত্রণালয় সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ওই সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। প্রতিবেদনে এইসব বিধিমালা পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২. সংবিধানের প্রস্তাবিত সংশোধনীর আলোকে চাকরি বিধিমালা সংশোধন

এই প্রতিবেদনে সংবিধানের ১১৩ এবং ১১৬ অনুচ্ছেদ সংশোধনের মাধ্যমে পৃথক সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা এবং বিচারকদের চাকরি বিষয়ে নির্বাহি বিভাগের নিয়ন্ত্রণ/ক্ষমতা যথাসম্ভব বিলোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। তদনুসারে সার্ভিস গঠন ও চাকুরি সংক্রান্ত অন্যান্য বিধিমালাগুলিকে সংবিধানের প্রস্তাবিত সংশোধনীর আলোকে সংশোধন করতে হবে যাতে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শকের ভূমিকার পরিবর্তে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা সেখানে প্রতিফলিত হয়। তবে পদোন্নতি এবং সংবিধানের ১৩৫ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত দণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন হবে। সংবিধানের প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুসারে রুলস অব বিজনেস এ আইন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা বিলোপ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:**

১. সংবিধানের প্রস্তাবিত সংশোধনী এবং প্রস্তাবিত সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় এর কার্যাবলির আলোকে বিচারকদের চাকুরি সংক্রান্ত উপরিউক্ত বিধিমালাসমূহ সংশোধন করতে হবে।

২. সংবিধানের প্রস্তাবিত সংশোধনী এবং প্রস্তাবিত সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় এর কার্যাবলির আলোকে সরকারের রুলস অব বিজনেস এবং তার তপশিল (এলোকেশন অব বিজনেস) থেকে আইন মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি বিলোপ করতে হবে।

৩. বিচারকদের জন্য বদলি নীতিমালা

প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যেকোনো ব্যক্তির ন্যায় বদলি অধস্তন আদালতের বিচারকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা তার কর্মদক্ষতাসহ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকরতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু বিচারকদের বদলি নীতিমালা প্রণয়ন বা অনুসরণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। ফলে অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে অনেক বিচারকই বদলি নামক প্রশাসনিক ব্যবস্থার ছদ্মাবরণে ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। অভিযোগ আছে অনেক ক্ষেত্রেই বদলি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হয়েছে। এর ফলে সুপ্রীম কোর্টসহ সমগ্র বিচার বিভাগের স্বাধনীতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকরতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, বিচার বিভাগ সংস্কারে কমিশনের অভিমত এই যে, বদলির বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণ করা একান্ত কাম্য।

---

[১৪] ৫২ ডিএলআর (এডি) ৮২।

বিচার কাজে বিচারকদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে বদলির নীতিমালা এমন হবে, যাতে করে নির্বাহী বিভাগ বদলির ভয় দেখিয়ে বিচারকদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। এছাড়াও বিচারকদের বদলির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এমন হওয়া উচিত যেন বিষয়টি তার কাছে সারপ্রাইজ আকারে না আসে এবং বদলির পূর্বে তাকে বদলি বিষয়ে প্রস্তুতি নেওয়ার যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়। বিচারককে যথাসম্ভব তার পছন্দমত স্টেশনে বদলির ব্যবস্থা করতে হবে যেন পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে তাকে চিন্তা করতে না হয় এবং বদলির কারণে তার দ্বারা সম্পাদিত বিচারকার্যের গুণগতমান ক্ষুন্ন না হয়। **[বিচারকদের বদলি সংক্রান্ত সুপারিশকৃত নীতিমালার জন্য কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এর ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।]**

**** সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:** পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের আলোকে বদলির বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণ করা একান্ত কাম্য।

৪. বিচারকদের আর্থিক সুবিধা

বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা সংক্রান্ত দ্বাদশ অধ্যায়ে অধস্তন আদালতের বিচারকদের বিভিন্ন আর্থিক সুবিধার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে আর্থিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে জুডিসিয়াল পে-কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

মাসদার হোসেন মামলায় প্রদত্ত ১২ দফা নির্দেশনার ৬ নম্বর দফায় বিচারকদের জন্য একটি আলাদা পে কমিশন গঠন করতে এবং উক্ত পে কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক তাদের বেতন ভাতা নির্ধারণের জন্য সরকারকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশ অনুসারে সরকার ২০০৭ সালের ১৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (পে-কমিশন) বিধিমালা, ২০০৭ জারি করে। বিধিমালার ৩ বিধির অধীনে এ পর্যন্ত মোট দুটি পে কমিশন গঠিত হয়েছে। বিচারকদের কাজের ধরন অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কাজের ধরন অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় উভয় পে কমিশন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিচারকদের জন্য জুডিসিয়াল ভাতা প্রদানের সুপারিশ করে। দ্বিতীয় পে কমিশন এই ভাতার হার ৩০% নির্ধারণ করে। কিন্তু সরকার পে কমিশনের রিপোর্ট পুরোপুরি বাস্তবায়ন না করে ২০১৬ সালের বেতন ভাতাদি আদেশ দ্বারা নতুন পে-স্কেল নির্ধারণ করে এবং জুডিসিয়াল ভাতার ক্ষেত্রে নতুন পে-স্কেলের পরিবর্তে অযৌক্তিকভাবে ২০০৯ সালের মূল বেতনকে জুডিসিয়াল ভাতা নির্ধারণের ভিত্তি হিসাবে গণনা করে।

উল্লেখ্য যে, বিচারকদের কর্মের গুণগত মান বজায় রাখতে হলে ভবিষ্যতে পে কমিশনের সুপারিশ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যেই মাসদার হোসেন মামলার ৬ নং নির্দেশে পরিষ্কার বলা হয়েছিল, "The pay etc of the judicial service shall follow the recommendations of the Commission"

এসব বিষয়ে পে-কমিশন বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি (৭) এর বিধানে সরকারকে প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, পে কমিশন বিধিমালার ৪ বিধির (৭) উপবিধিটি বাতিল করে পে-কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে এমন বিধান উক্ত উপবিধিতে সন্নিবেশিত করতে হবে।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:**
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (পে-কমিশন) বিধিমালা, ২০০৭ এর ৪ নং বিধির (৭) উপবিধিটি, "এই বিধির অধীনে প্রদত্ত সুপারিশ অনুসরণ করিয়া সরকার প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করিবে।" এভাবে প্রতিস্থাপন করতে হবে।

৫. বিচারকদের মর্যাদা

এ বিষয়ে বাংলাদেশ বনাম মো: আতাউর রহমান ও অন্যান্য মামলায়[১৫] আপীল বিভাগ তাঁর প্রদত্ত রায়ে জেলাজজ ও সমপদমর্যাদার বিচারকদের সরকারের সচিবের সমমর্যাদা (ওয়ারেন্ট অব পিসিডেন্স এর ১৬ নম্বর ক্রমিকে) এবং

[১৫] ৬৯ ডিএলআর (এডি) (২০১৭) ১৭

অতিরিক্ত জেলাজজদের সরকারের সচিবের সমমর্যাদার অন্যান্য কর্মকর্তাদের (ওয়ারেন্ট অব পিসিডেন্স এর ১৭ নম্বর ক্রমিকে) সমমর্যাদা প্রদান করেছেন।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:**
আইন ও বিচার বিভাগে বিচারকদের প্রেষণে নিয়োগ সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন করে বাংলাদেশ বনাম মো: আতাউর রহমান ও অন্যান্য মামলায়[১৬] বিচারকদের প্রদত্ত মর্যাদা অনুসারে প্রেষণে পদায়নের বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬. বিচারকদের জন্য পালনীয় আচরণবিধি

বর্তমানে বিচারকদের ক্ষেত্রেও সরকারি কর্মচারিদের জন্য পালনীয় ১৯৭৯ সালের আচরণবিধি প্রযোজ্য। এছাড়া ক্রিমিনাল রুলস এন্ড অর্ডারস, ২০০৯ এর ৬৬৭ নং বিধির অধীনে 'বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা' তৈরি করা হয়েছে যা বিচারকদের মেনে চলতে হবে। কিন্তু এই বিধিগুলোতে বিচারকগণ কীভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করবেন সেই বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা নেই। এছাড়াও আরো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিচারকগণ কর্তৃক পালনীয় আচরণ সম্পর্কে উল্লিখিত বিধিগুলো নিশ্চুপ। এমতাবস্থায়, বিচারকদের জন্য পালনীয় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আচরণবিধি তৈরি ও জারি করা উচিত বলে কমিশন মনে করে, যার ব্যত্যয় ঘটলে সুপ্রীম কোর্ট বিচারকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:**

১. *বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণের আচরণ বিধিমালা*, ২০২৫[১৭] শিরোনামের খসড়া আচরণবিধিটি সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি করতে হবে। [পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য]

২. জুডিসিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা, ২০১৭ এর ২ নং বিধির (চ) (১) দফায় ভুলভাবে উল্লিখিত এবং অস্তিত্ববিহীন "বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস সদস্যগণের আচরণ বিধিমালা, ২০১৭" প্রতিস্থাপন করে " বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যগণের আচরণবিধিমালা, ২০২৫" অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

[১৬] পাদটীকা ২২ দেখুন।
[১৭] পরিশিষ্ট ৪ দেখুন।

পঞ্চম অধ্যায়: সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়

১. মাসদার হোসেন মামলার রায়, সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদ এবং অন্যান্য বিষয়ের আলোকে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশনা: মাসদার হোসেন মামলার রায়ের ১২ দফা নির্দেশনায় বিচার বিভাগের উপর সুপ্রীম কোর্টের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা এবং আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের প্রভাব বলয় থেকে যথাসম্ভব মুক্ত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্টভাবে ৩ (তিন) টি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে, যথা: (১) বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, (২) বিচারকদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি বিষয়ক নিশ্চয়তা এবং (৩) বিচারকদের চাকরির মেয়াদকালের নিশ্চয়তা। তাছাড়া বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতার উপরও সমানভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের এই নির্দেশনাগুলি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও ঘোষিত বিভিন্ন নীতিমালায় প্রতিফলিত হয়েছে। এ সকল ঘোষণা, নির্দেশনা এবং সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।

২. বিচার বিভাগে বিরাজমান দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান প্রক্রিয়ায় সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা
বিদ্যমান সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে নির্বাহি বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকিকরণের মূলনীতি, ৯৪(৪) অনুচ্ছেদে ঘোষিত বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের স্বাধীনতা, ১১৬ক অনুচ্ছেদে অধস্তন আদালতের বিচারকদের অনুরূপ স্বধীনতা, ১০৯ অনুচ্ছেদে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম, ১১৬ অনুচ্ছেদে অধস্তন আদালতের বিচারকদের কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা বিধান ইত্যাদি সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। এ সকল বিষয়ে সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রি দুই ধরনের দায়িত্ব পালন করে, যথা: সুপ্রীম কোর্টের নিজস্ব বিচারিক কার্যক্রম এবং অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়াবলির ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শমূলক ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান। উল্লেখ্য যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগসহ অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়ে বর্তমানে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু আছে। যার নানাবিধ নেতিবাচক ফল বিচার ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এমতাবস্থায়, কমিশন বিদ্যমান দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শকের ভূমিকার পরিবর্তে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য নানাবিধ সংস্কার প্রস্তাব করা হয়েছে। তারই অংশ হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

৩. সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের আইনি কাঠামো
বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের মূলনীতি বাস্তবায়ন করতে হলে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শকের ভূমিকার পরিবর্তে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে। সুপ্রীম কোর্টের এই ভূমিকা পালনে সহায়তা করার জন্য সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য[১৮]। এজন্য প্রয়োজন সংবিধানের ১১৩ অনুচ্ছেদ সংশোধনক্রমে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্তকরণ এবং তদধীনে একটি আইন প্রণয়ন করা।

৪. সচিবালয়ের জনবল, অবকাঠামো ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি
দেশের বিচার বিভাগ এবং বিচার বিভাগের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান, বিভাগ বা দপ্তর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের একটি সময়োপযোগী সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করতে হবে। এই সাংগঠনিক কাঠামোতে দুটি ইউনিট থাকবে যথা সুপ্রীম কোর্ট ইউনিট এবং বিচার-কর্মবিভাগ ইউনিট। বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, বাজেট ব্যবস্থার কাঠামোগত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি বিচার বিভাগের আওতাধীন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের দৈনন্দিন কার্যক্রমের তদারকি, বিচার ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ইত্যাদি পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা ও দপ্তর সচিবালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সচিবালয়ের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো বিষয়ে অনুচ্ছেদ ৫ এ বিস্তারিত বর্ণিত হলো।

---

[১৮] পঞ্চম অধ্যায় দেখুন।

৫. সচিবালয়ের অনুবিভাগ ও দপ্তর

অনুবিভাগ: ১. প্রশাসন অনুবিভাগ; ২. বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ; ৩. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ; ৪. শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুবিভাগ; ৫. গবেষণা ও সংস্কার অনুবিভাগ; ৬. ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ; ৭. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ; ৮. পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ; ৯. ই-জুডিসিয়ারি অনুবিভাগ; ১০. রিপোর্ট অনুবিভাগ।

অনুবিভাগগুলোর দায়িত্ব প্রদান করতে হবে যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের। প্রতি ২টি অনুবিভাগ সমন্বয়ের জন্য একজন অতিরিক্ত সচিবকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। ১০টি অনুবিভাগের জন্য ১০টি যুগ্মসচিব এবং ৫টি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজন করতে হবে।

সাংগঠনিক কাঠামোতে ২৫টি অধিশাখা এবং ৪৮টি শাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। অধিশাখার দায়িত্বে থাকবেন উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা এবং শাখার দায়িত্বে থাকবেন সিনিয়র সহকারি সচিব/সহকারি সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। প্রত্যেক অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা এবং সেল/ইউনিটের জন্য পদ সৃজন করতে হবে। শুধু সাংগঠনিক কাঠামো নয় সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিশেষ করে ভবন নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিস স্থাপন করতে হবে। নির্মিত ভবন ও স্থাপিত অফিসে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য দ্রব্যাদির সরবরাহ করতে হবে। এ ব্যাপারে সচিবালয়ের জন্য সুপ্রীম কোর্টের ভিতরে বা সুপ্রীম কোর্ট সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী কোনো স্থানে সুনির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণপূর্বক সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের জন্য আলাদা ভবন নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

৬. সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার পর আইন মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি

সংবিধানে বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি সংশোধন (দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এবং তদনুসারে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বিচার বিভাগ বিষয়ে দ্বৈত শাসন এর অবসান হবে। তৎপ্রেক্ষিতে আইন মন্ত্রণালয়ের কার্য পরিধি সংকুচিত হবে। তবে বিচার বিভাগের কিছু কিছু বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতা থেকে যাবে, যেমন: সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে বিচার-কর্মবিভাগের প্রবেশ পদ- সহকারী জজ পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ, চাকরি বিধিমালা অনুসারে বিচারকদের পদোন্নতি এবং সংবিধানের ১৩৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিচারকদের অপসারণের গুরুদন্ড প্রদান, ইত্যাদি। তাছাড়া বিচার বিভাগের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বিষয়ে সরকার তথা আইন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতা সীমীত আকারে হলেও থেকে যাবে। এ সকল বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সরকারের Rules of Business, 1996 (Allocation of Business সহ) যথাযথভাবে সংশোধন করতে হবে।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:**

(১) বিচার বিভাগের পুর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে কার্যকরভাবে পৃথকীকরণের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় স্থাপন করতে হবে।

(২) সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় স্থাপনের জন্য একটি স্বতন্ত্র আইন বা অধ্যাদেশ প্রণয়ন করতে হবে।

(৩) Rules of Business, 1996 সংশোধন করতে হবে।

(৪) Allocation of Business সংশোধনের মাধ্যমে আইন ও বিচার বিভাগ এবং বিচার বিভাগীয় সচিবালয়ের কার্যপরিধি পৃথকীকরণপূর্বক স্ব স্ব কার্যপরিধি সন্নিবেশিত করতে হবে।

(৫) বিচার বিভাগের দাপ্তরিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের অধীনে প্রয়োজনীয় বিধি ও সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় নির্দেশমালা প্রণয়ন করতে হবে।

(৬) বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট যে সকল বিষয়ে সরকার তথা আইন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার প্রয়োজন, সে সকল বিষয় যথাসময়ে ও সুচারুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যগণকে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেষণে নিয়োগের বিদ্যমান ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।

(৭) সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের জন্য পৃথক জনবল কাঠামো সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত ও অনুমোদন করতে হবে। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত জনবলের পদ সৃষ্টিসহ অফিস সরঞ্জামাদির প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

(৮) সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ

১. ভূমিকা: সংবিধানে স্বীকৃত মূলনীতি ও অধিকারকে জনসাধারণের জন্য প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলে বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার প্রতিকার বিধানের দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্ট ও অন্যান্য আদালতের। বাংলাদেশের জনসংখ্যার সিংহভাগ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। সুতরাং তাদের জন্য সংবিধানে স্বীকৃত সুবিচারের অঙ্গীকারকে বাস্তবায়ন এবং তাদের মৌলিক অধিকারগুলোকে অর্থবহভাবে প্রয়োগ ও নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগ ও আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাসম্ভব তাদের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার কোন বিকল্প নেই। এই উপলব্ধি থেকে বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণ যৌক্তিক ও বাস্তবায়নযোগ্য বলে কমিশন মনে করে।

২. হাইকোর্ট বিভাগের কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণ: বাংলাদেশের সংবিধানের ১০১ অনুচ্ছেদে সংবিধান বা অন্য কোন আইনের মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগের উপর আদি, আপীল ও অন্যান্য বিষয়ে এখতিয়ার ও ক্ষমতা অর্পণের বিধান রয়েছে। ১০২(১) অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্ট বিভাগের উপর সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলো বলবৎ করার এখতিয়ার অর্পিত হয়েছে। এমনকি, ৪৪ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য ১০২(১) অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা করার অধিকারকেও একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মৌলিক অধিকার বলবৎ করার প্রধান স্থান হলো হাইকোর্ট বিভাগ। এছাড়াও, সংবিধানের ১০২(২)(ক) অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তাদের কৃত বা করণীয় কোনো কার্যক্রমের বিষয়ে জবাবদিহি করার এখতিয়ার হাইকোর্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত। একইভাবে ১০২(২)(খ) অনুচ্ছেদ অনুসারে কেবলমাত্র হাইকোর্ট বিভাগেরই কোন ব্যক্তির আটক থাকার বৈধতা এবং কোন ব্যক্তির সরকারি পদে আসীন থাকার বৈধতার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আদেশ ও নির্দেশ দেয়ার এখতিয়ার রয়েছে। বলা বাহুল্য, হাইকোর্ট বিভাগের যাবতীয় কর্মকাণ্ড দেশের রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার অর্থ হলো, হাইকোর্ট বিভাগের শরণাপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বিচারপ্রার্থীর রাজধানীর মুখাপেক্ষী হওয়া এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও সময় ব্যয় করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন পরিচালিত অনলাইন জরিপের অংশ হিসাবে ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগ থাকা উচিৎ কি না এই প্রশ্নটি করা হয়েছিলো। নাগরিক, আইনজীবী, সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ও অধস্তন আদালতের বিচারক - এই চার শ্রেণির উত্তরদাতার প্রদত্ত উত্তরের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

উত্তরদাতার শ্রেণি	ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগের উপস্থিতির পক্ষে উত্তর	প্রতিটি বিভাগীয় সদরে হাইকোর্ট বিভাগের উপস্থিতির পক্ষে উত্তর
নাগরিক	৯৩.৮%	৬৬.৪%
আইনজীবী	৮৫.৯%	৬৮.৬%
সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী	৬১.৩%	৪৫.২%
অধস্তন আদালতের বিচারক	৯৩.৯%	৭২.২%

সংস্কার কমিশনের সাথে বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী অংশীজনদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশও জনসংখ্যা ও মামলার সংখ্যা বিবেচনায় ঢাকার বাইরে, অন্ততঃপক্ষে বিভাগীয় পর্যায়ে, হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপনের পক্ষে মতামত দেন।

সংবিধানে প্রথম থেকেই ১০০ অনুচ্ছেদের অধীনে ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠানের বিধান থাকলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিস্পৃহতা লক্ষণীয়। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম উদ্যোগ নেয়া হয় সামরিক শাসনের অধীনে ৮ জুন ১৯৮২ তারিখে ঢাকা, কুমিল্লা, রংপুর ও যশোরে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ গঠন করা হয় এবং পরে আরো তিনটি বেঞ্চ এই তালিকায় যুক্ত হয়। এক পর্যায়ে সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে রাজধানীর বাইরে

৬ (ছয়) টি জেলা-সদরে (এর মধ্যে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম ছিলো বিভাগীয় সদর দপ্তর) স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার বিধান সন্নিবেশ করে ১০০ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হয়।
কিন্তু সামরিক শাসনের অধীনে এই বিকেন্দ্রীকরণকে প্রথম থেকেই দেশের রাজনৈতিক মহল, ঢাকাস্থ আইনজীবীদের নেতৃস্থানীয় একটি অংশ ও নাগরিকসমাজের কিছু অংশ নেতিবাচকভাবে দেখেন। অন্যদিকে ঢাকার বাইরের আইনজীবীদের একটি অংশ বিকেন্দ্রীকরণকে স্বাগত জানান। তবে এক পর্যায়ে সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হলে, ৮ম সংশোধনী মামলার রায়ে (*আনোয়ার হোসেন* বনাম *বাংলাদেশ*[১৯]) সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকদের মতামতের ভিত্তিতে সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদের সংশোধনীকে সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী ও বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়।

৮ম সংশোধনী মামলার সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় এবং সংখ্যালঘু মতামত বিশ্লেষণক্রমে কমিশন মনে করে যে, হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনে যে সাংবিধানিক কাঠামো ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিলো তার ত্রুটিগুলো নিরসনের মাধ্যমে পুনরায় এ উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব। সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, জনগণের ন্যায়বিচার-প্রাপ্তিকে সহজলভ্য করা এবং তাদের ভোগান্তি কমানোর লক্ষ্যে হাইকোর্ট বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ একটি জোরালো দাবি, যা সংস্কার কমিশন উপক্ষো করতে পারে না।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:** কমিশন মনে করে যে, রাজধানীর বাইরে বিভাগীয় পর্যায়ে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের জন্য নিম্নবর্ণিত আইনগত বৈশিষ্ট্য ও বাস্তব বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে সংবিধানে এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট বিধান অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন:

(ক) রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে এবং রাজধানীর বাইরে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ থাকবে। প্রত্যেক স্থায়ী বেঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে বিচারপতিদের মনোনয়ন করবেন এবং তাদের বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করবেন।

(খ) প্রত্যেকটি স্থায়ী বেঞ্চ কোন্ কোন্ এলাকা থেকে উদ্ভূত মামলা গ্রহণ করতে পারবে তা বিধিমালায় সুনির্দিষ্ট করা হবে। তা সত্ত্বেও, হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ারের পূর্ণাঙ্গতা বা অবিভাজ্যতা (plenary jurisdiction) এমনভাবে বজায় রাখতে হবে, যেন স্থায়ী বেঞ্চগুলো স্থাপনের কারণে দেশের সর্বত্র কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার কোন ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা বিভাজিত (fragmented) না হয়, এবং রাষ্ট্রের একক (unitary) চরিত্র ক্ষুণ্ন না হয়। অর্থাৎ বিচারপ্রার্থী জনগণ যেন তাদের নিকটতম স্থায়ী বেঞ্চে মামলা দায়েরের সুবিধা পায়, কিন্তু একইসাথে বিচারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেন তারা ভৌগলিক সীমারেখার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) সংবিধানে এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমিলায় সুস্পষ্ট বিধান থাকবে যে, কোন মামলার বিষয়বস্তু, যেমন: মামলার পক্ষদের ঠিকানা / অবস্থান, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অবস্থান, মামলার কারণ উদ্ভুত হওয়ার স্থান, ইত্যাদি, যেকোন একটি বিষয়ের সাথে কোন স্থায়ী বেঞ্চের আওতাধীন ভৌগলিক এলাকার সংশ্লিষ্টতা থাকলে ওই বেঞ্চ মামলাটি গ্রহণ করতে পারবে। তবে, মামলার বিষয়বস্তু বিবেচনার ক্ষেত্রে বা মামলায় আদেশ, নির্দেশ, রায় প্রদানের ক্ষেত্রে, ওই বেঞ্চের কোন ভৌগলিক সীমারেখা থাকবে না, অর্থাৎ মামলায় বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ ভূ-খণ্ডের উপর উক্ত বেঞ্চের পূর্ণ এখতিয়ার (plenary jurisdiction) থাকবে। ফলে, হাইকোর্ট বিভাগের একক কাঠামো এবং রাষ্ট্রের এক-কেন্দ্রিক (unitary) চরিত্র বজায় থাকবে।

(ঘ) কোনো স্থায়ী বেঞ্চে কোনো কার্যধারা বিচারাধীন থাকাকালে প্রধান বিচারপতি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বা কোনো আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তা অন্য কোনো বেঞ্চে স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারবেন।

(ঙ) স্থায়ী বেঞ্চগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো, সহায়ক জনবল এবং প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

[১৯] ১৯৮৯ বিএলডি (বিশেষ) ১

(চ) সবগুলো স্থায়ী বেঞ্চ একই সাথে কার্যকর করা কঠিন বিবেচিত হলে প্রয়োজনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় সদরদপ্তরগুলোতে স্থায়ী বেঞ্চ কার্যকর করা যেতে পারে।

৩. অধস্তন আদালতের সম্প্রসারণ

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। তাদের জন্য বিচারপ্রাপ্তিকে সহজলভ্য করতে হলে অধস্তন আদালতের সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরি। ১৯৯১ সালে উপজেলা আদালতগুলো প্রত্যাহারের পর দেশের বিভিন্ন উপজেলা সদরে বর্তমানে ৬৭টি "চৌকি আদালত" চলমান রয়েছে। চৌকি আদালতের বিচারকরা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহায়ক জনবল জেলা সদর থেকে যাতায়াত করেন। ফলে আদালতের সময়ানুবর্তিতা অনেকক্ষেত্রেই নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। চৌকি আদলতগুলোর কোন স্থায়ী অবকাঠামো বা জনবল নেই। ফলে, অনেক ক্ষেত্রেই অন্য কোন সরকারি ভবনে কয়েটি কক্ষ ধার করে চৌকি আদালত চালাতে হয়। আদালতের নিজস্ব কোন যানবাহন না থাকায় বিচারক ও সহায়ক কর্মচারিদের গণপরিবহনযোগে কর্মক্ষেত্রে আসতে যেতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন মনে করে যে বিদ্যমান চৌকি আদালত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের জনগণের বিচারপ্রাপ্তির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। উপজেলা পর্যায়ে আদালত পরিলনার মাধ্যমে অর্থবহ ও কার্যকরভাবে জনসাধারণের জন্য সুবিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হলে উপজেলা পর্যায়ে স্থায়ীভাবে আদালত স্থাপন ও পরিচালনা করা অপরিহার্য।

তবে কমিশন এটাও মনে করে যে বর্তমান বস্তবতায় ঢালাওভাবে দেশের সবকটি উপজেলায় স্থায়ী আদালত স্থাপনের প্রয়োজন নেই। কারণ অনেকক্ষেত্রেই উপজেলা এলাকা থেকে জেলা সদরে যাতায়াত আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়ে গেছে। তাছাড়া, অনেক জায়গায় ভৌগোলিকভাবেই জেলা-সদর ও উপজেলা-সদরের অবস্থান এমন যে তাদের মধ্যে দূরত্ব খুবই অল্প। তাই সাধারণ মানুষের বিচারপ্রাপ্তির সুবিধার দৃষ্টিকোন থেকে সকল উপজেলা সদরে স্থায়ী আদালত স্থাপনের বাস্তব প্রয়োজন নাও থাকতে পারে।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:** উপরিউক্ত প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত স্থায়ী আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য কমিশন প্রস্তাব করছে:

(ক) উপজেলা সদরের ভৌগলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য, জেলা-সদর থেকে দূরত্ব ও যাতায়াত ব্যবস্থা, জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বিন্যাস এবং মামলার চাপ বিবেচনা করে কোন্ কোন্ উপজেলায় স্থায়ী আদালত স্থাপন করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে হবে।

(খ) বর্তমানে যেসব উপজেলায় চৌকি আদালত আছে, সেগুলোর প্রয়োজন এবং অধিক্ষেত্র পুনর্বিবেচনা ও পুনর্বিন্যাসের সুযোগ আছে কি না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।

(গ) বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে উপজেলা-সদরে স্থাপিত কোনো আদালতের জন্য একাধিক উপজেলাকে সমন্বিত করে অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করার প্রয়োজন হলে, তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

(ঘ) উপজেলা আদালতগুলোতে সিনিয়র সহকারি জজ ও প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের বিচারকদের পদায়ন করতে হবে।

(ঙ) আইনগত সহায়তা কার্যক্রম উপজেলা পর্যায়ে কার্যকরভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে[২০]।

(চ) উপজেলা স্তরে আদালতের সম্প্রসারণ ছাড়াও বিচারপ্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিতকরণে বৃহত্তর মহানগরগুলোতেও আদালতব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন[২১]।

(ছ) সিভিল কোর্টস্ অ্যাক্ট, ১৮৮৭ এবং ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ – এর বিদ্যমান বিধানগুলোর অধীনেই উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব। প্রয়োজন হলে এক্ষেত্রে কোন সম্পূরক বিধানও প্রণয়ন করা যেতে পারে।

[২০] এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার জন্য অষ্টাদশ অধ্যায় দেখুন।

[২১] একাদশ অধ্যায়ে এসব এলাকার আদালতের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়: স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: মূল প্রতিবেদনে কোনো কোনো স্থানে 'সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস' শব্দগুলোর পরিবর্তে ভুলক্রমে 'জাতীয় অ্যাটর্নি সার্ভিস' উল্লেখিত হয়েছে। এই সংক্ষেপিত প্রতিবেদনে তা সংশোধনক্রমে 'জাতীয়' শব্দের পরিবর্তে 'সরকারি' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তছাড়া যথাযথ ক্ষেত্রে 'সার্ভিস' শব্দটির পরিবর্তে 'ইউনিট' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।]

১. সরকারি মামলা পরিচালনার বর্তমান ব্যবস্থা

বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলায় জড়িত পক্ষগণের ধরন বিচারে নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়:

- অধিকাংশ ফৌজদারি মামলা পরিচালনায় সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে।
- দেওয়ানি মামলাগুলোর উল্লেখযোগ্য অংশে সরকারের স্বার্থ জড়িত থাকে।
- হাইকোর্ট বিভাগে প্রায় সকল মামলায় সরকার পক্ষভুক্ত থাকে।

অ্যাটর্নি জেনারেলের পদকে একটি সাংবিধানিক পদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মূলত সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যক মামলা পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে। কিন্তু তাঁকে সহায়তা করার জন্য তিনটি স্তরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলেও তাদের বিষয়ে সংবিধানে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া জেলা পর্যায়ের আদালতগুলোতে সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনার জন্য তিনটি স্তরের পাবলিক প্রসিকিউটর এবং দুইটি স্তরের গভর্নমেন্ট প্লিডার রয়েছেন।

২. অ্যাটর্নি সংক্রান্ত বর্তমান বিধানাবলি

২.১. অ্যাটর্নি জেনারেল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৪ অনুসারে রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগদান করেন।

> ৬৪। (১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগদান করিবেন।
>
> (২) অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।
>
> (৩) অ্যাটর্নি-জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংরাদেশের সকল আদালতে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার থাকিবে।
>
> (৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

অ্যাটর্নি-জেনারেলের চাকরির শর্তাবলি Attorney-General (Terms and Conditions of Service) Rules, 1973 দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২.২. অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল

রাষ্ট্রপতি The Bangladesh Law Officers Order, 1972 এর অধীন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগদান করেন। তাদের চাকরির শর্তাবলি Law Officers (Terms and Conditions of Service) Rules, 1973 দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২.৩. পাবলিক প্রসিকিউটর ও গভর্নমেন্ট প্লিডার

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৪৯২ - ৪৯৫ ধারার মাধ্যমে পাবলিক প্রসিকিউটর সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া লিগ্যাল রিমেমব্রেন্সার ম্যানুয়েলে গভর্নমেন্ট প্লিডার নিয়োগের বিষয়ে উল্লেখ আছে। এর বাইরে সরকারি মামলা পরিচালনার জন্য বিস্তারিত কোন আইনী কাঠামো নেই।

৩. বর্তমান ব্যবস্থার সমস্যা

৩.১ এ যাবত অ্যাটর্নি জেনারেলসহ সকল স্তরের আইন কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছেন মূলত রাজনৈতিক বিবেচনায় এবং অপ্রতুল আইনি কাঠামোর আওতায়। আইন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন বিষয়ে জবাবদিহিতার কোনো আইনি

কাঠামো নেই। যোগ্যতা বা দক্ষতা বা সততা নয়, মূলত আইন কর্মকর্তাগণের নিয়োগকে বিবেচনা করা হয় রাজনৈতিক আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে।

সম্প্রতি নির্মিত অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস ব্যতীত জেলা পর্যায়ে কোনো আইন কর্মকর্তার জন্য পৃথক অবকাঠামো, সহায়ক জনবল, বাজেট বা আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। ফৌজদারি মামলার তদন্তকারী ব্যক্তি অথবা সংস্থার সাথে আইন কর্মকর্তাদের মতামত গ্রহণ বা গুরুত্ব দেওয়ার বাধ্যবাধকতাও নেই। জেলা পর্যায়ের আইন কর্মকর্তার জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক অতি নগণ্য। কমিশনের সাথে মতবিনিময়ের সময় ঢাকা জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এবং গভর্নমেন্ট প্লিডার (জিপি) জানান যে তাঁদের মাসিক সম্মানি/পারিশ্রমিক মাত্র ১৫ হাজার টাকা।

৩.২ স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিসের ধারণাটি নতুন নয়

১৯৯৬ সালের আইন কমিশন আইনের ৬ ধারায় উক্ত আইনের অধীনে গঠিত আইন কমিশনের কার্যাবলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উক্ত আইনের ৬। (ক) ধারার দফা (৬) অনুসারে আইন কমিশনের বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্যে একটি হলো:

> "ফৌজদারি মামলার অভিযোগ তদন্ত করিবার জন্য স্বতন্ত্র তদন্তকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠার এবং সরকারের পক্ষে বিভিন্ন মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি অধিকতর দক্ষ এবং জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা যাচাই করতঃ তৎসম্পর্কে গ্রহণীয় পদক্ষেপের সুপারিশ" করা।

উক্ত আইন প্রণয়নের প্রায় ৩০ বছর অতিক্রান্ত হলেও আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে এই ধরনের একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নি।

৪. প্রস্তাবিত স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিসের বৈশিষ্ট্য:

- অ্যাটর্নি সার্ভিস হবে একটি স্থায়ী পেনশনযোগ্য সরকারি চাকরি।
- সার্ভিসের জন্য সুনির্দিষ্ট কাঠামো, নিয়োগ পদ্ধতি, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা, বেতন কাঠামোসহ আর্থিক সুবিধাদি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে যথাযথ বিধান সম্বলিত আইন থাকবে।
- পর্যাপ্ত অবকাঠামো, বাজেট বরাদ্দ ও সহায়ক জনবলের ব্যবস্থা থাকবে।
- প্রস্তাবিত সার্ভিসের দুটি শাখা থাকবে: (ক) সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিট এবং (খ) সহকারি জেলা অ্যাটর্নি, সিনিয়র সহকারি জেলা অ্যাটর্নি, যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নি, অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নি এবং জেলা অ্যাটর্নি সমন্বয়ে গঠিত জেলা অ্যাটর্নি ইউনিট।
- চাকরির শর্ত অনুযায়ী জেলা ইউনিটের কর্মকর্তাদের আন্তঃজেলা বদলি, জেলা ইউনিট থেকে সুপ্রীম কোর্ট ইউনিটে বদলি ও পদোন্নতির সুযোগ থাকবে।
- সুপ্রীম কোর্ট ইউনিট থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন অ্যাটর্নি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
- অ্যাটর্নি সার্ভিসের প্রশাসনিক, আর্থিক, অবকাঠামো এবং সহায়ক জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের একটি পৃথক ইউনিটের উপর।
- জেলা অ্যাটর্নি ইউনিটে কর্মরত সংশ্লিষ্ট অ্যাটর্নি প্রতিটি তদন্তযোগ্য মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া তদারকির দায়িত্বে থাকবেন।
- উক্ত অ্যাটর্নি কর্তৃক তদন্ত তত্ত্বাবধান বা মামলা পরিচালনায় নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কোনো হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

- স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিসের প্রস্তাবে ক্রান্তিকালীন বিধান রাখা হবে যাতে প্রস্তাবিত রূপরেখা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেও অ্যাটর্নি সার্ভিস কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে।

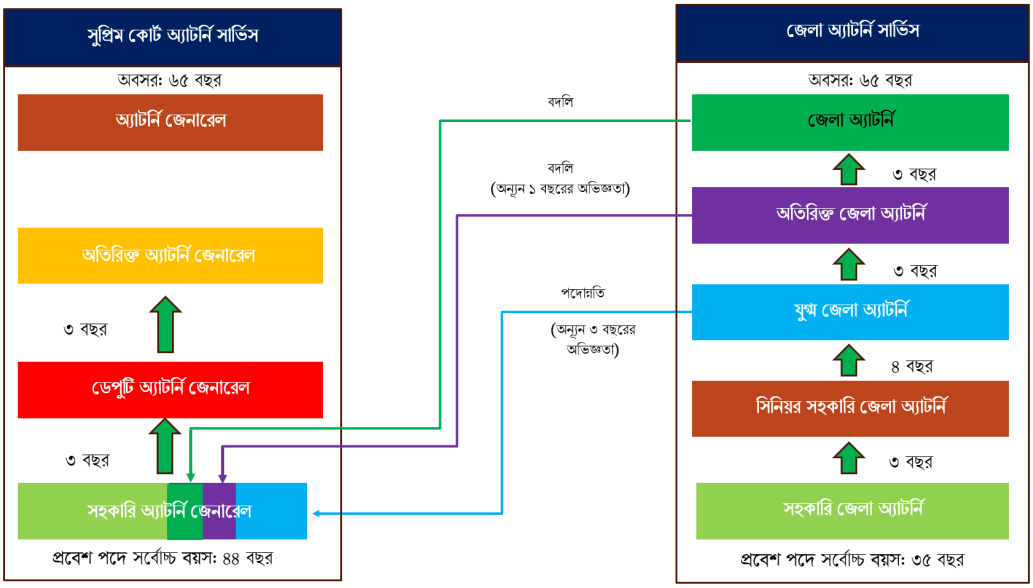

সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিট ও জেলা অ্যাটর্নি ইউনিটের জনবল কাঠামোর রূপরেখা

৫.১. সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা

১. গরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস সুপ্রীম কোর্টসহ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের আদালতে সরকারের পক্ষ মামলা পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবে।
২. দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা ব্যবহারে সার্ভিস স্বাধীন থাকবে।
৩. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিস ও জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিস নামে সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিসের দুটি শাখা থাকবে।
৪. সার্ভিসে নিযুক্ত অ্যাটর্নিগণ সরকারি আইন কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হবেন।
৫. সার্ভিসের যে কোন শাখায় স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ সরকারি কর্মচারি এবং প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হিসেবে গণ্য হবেন।

৫.২. সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস পরিচালনার মূলনীতি

অর্পিত দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা ব্যবহারে সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করবে:

১. ন্যায়বিচার;
২. আইনি ব্যবস্থার অপব্যবহার প্রতিরোধ;
৩. জনস্বার্থ।

৫.৩. সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিসের কর্মপরিধি

১. জেলা অ্যাটর্নি ইউনিটে নিযুক্ত অ্যাটর্নিগণ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে সরকারের পক্ষে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে দায়িত্ব পালন করবেন।
২. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটে নিযুক্ত অ্যাটর্নিগণ সুপ্রীম কোর্টে সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটে নিযুক্ত অ্যাটর্নিগণ সুপ্রীম কোর্টে সরকারের পক্ষে মামলা দায়ের বা পরিচালনার বিষয়ে অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদ্দুদ্দেশ্যে মনোনীত কোন কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বা পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

৪. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটে নিযুক্ত অ্যাটর্নিগণ অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত হইলে, সরকারের পক্ষে সুপ্রীম কোর্ট ছাড়াও ঢাকায় বা ঢাকার বাহিরে অবস্থিত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালেও দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করতে পারবেন।

৫. সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিসের দায়িত্ব পালনের জন্য অতিরিক্তি অ্যাটর্নি-জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল ও সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেলদের সকল আদালতে বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে।

৬. সরকারের পক্ষে মামলা দায়ের ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিস দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে পুলিশ সুপারিটেনডেন্টের [কোন আইনের অধীন বা দ্বারা কোন মহানগর এলাকায় পৃথক মহানগর পুলিশ বা আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের স্থলে পুলিশ কমিশনার বা, ক্ষেত্রমতে, উপ-পুলিশ কমিশনার] সঙ্গে [জাতীয় তদন্ত সংস্থা স্থাপিত হলে জেলা তদন্ত কর্মকর্তার সঙ্গে] প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করবেন।

৭. জেলা অ্যাটর্নি ইউনিটে নিযুক্ত অ্যাটর্নিগণ, সরকার বা জেলা অ্যাটর্নি কর্তৃক নির্দেশিত হইলে, সংশ্লিষ্ট জেলায় Civil Courts Act, 1887 বা Code of Criminal Procedure, 1898 এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সাধারণ দেওয়ানি বা ফৌজদারি আদালত ছাড়াও, অন্য কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন আদালতেও সরকারের পক্ষে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা দায়ের ও পরিচালনা করতে পারবেন।

৮. সরকারের পক্ষে কোন আদালতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি, উভয়বিধ, মামলা পরিচালনার বিষয়ে জেলা অ্যাটর্নির সঙ্গে সার্বিক সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত থাকবে।

৯. অ্যাটর্নি জেনারেলসহ অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিযুক্ত সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিস এবং জেলা অ্যাটর্নি ইউনিটে র অ্যাটর্নিগণ সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিগত বা বেসরকারি মামলা পরিচালনা করতে পারবেন না।

৫.৪. ফৌজদারি মামলার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা

১. আপাতত বলবত কোন আইনে সংঘটিত অপরাধের তদন্ত শেষে, যদি সার্ভিসের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, সংগৃহিত সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে উক্ত অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা যাবে না, সেই ক্ষেত্রে সার্ভিস উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করে, মামলা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে;

২. কোর্ট মার্শাল ব্যতীত অন্য সকল ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে সার্ভিস মামলা দায়ের ও পরিচালনা করতে পারবে;

৩. অন্য ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ফৌজদারি মামলার পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে পারবে;

৪. ফৌজদারি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এই মর্মে তথ্য পাওয়ার পর, পুলিশ বা অন্য কোন ফৌজদারি অপরাধ তদন্তকারী সংস্থাকে, তদন্ত করে আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারবে;

৫. উপরিউক্ত বিধান প্রাথমিক শুনানি, সংক্ষিপ্ত শুনাানিসহ ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ সহ আপাতত বলবত অন্য যে কোন ফৌজদারি কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৬. সরকারি অ্যাটর্নি অধিদপ্তর

১. সার্ভিসের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য ***সরকারি অ্যাটর্নি অধিদপ্তর*** নামে একটি অধিদপ্তর থাকবে।

২. অধিদপ্তরের একজন মহা-পরিচালক থাকবে এবং অধিদপ্তরের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারি থাকবে। সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক ও অন্যান্য প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দান করবে।

৩. মহা-পরিচালক অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হবেন এবং অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারি তার অধস্তন হবেন ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকবেন।

৪. সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণকে নিয়োগ করা হবে। তবে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত মহা-পরিচালক, অধিদপ্তরের দ্বিতীয়,

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে, অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন ও অনুরূপ সরকারি পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ বিধানাবলি অসুসরণ সাপেক্ষে, নিয়োগ দান করবেন।

৫. অধিদপ্তর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত থাকবে।

৬. অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকবে।

৭. প্রতিটি জেলা সদরে, যতদূর সম্ভব, জেলা আদালতে কিংবা জেলা আদালতের সন্নিকটে, অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় থাকবে।

৮. অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় থেকে সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিসের জেলা অ্যাটর্নি ইউনিটে র কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে।

৭. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ

১. বিচার ও মামলা সম্পর্কিত বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটের নিয়ন্ত্রণ অ্যাটর্নি-জেনারেল এর উপর ন্যস্ত থাকবে এবং তদুদ্দেশ্যে উক্ত শাখায় নিযুক্ত অবশিষ্ট অ্যাটর্নিগণসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ তাঁর অধস্তন গণ্য হবেন।

২. চাকরি সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট শাখায় নিযুক্ত অ্যাটর্নিগণসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারির উপর মহা-পরিচালকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে এবং তদুদ্দেশ্যে তাঁরা মহা-পরিচালকের অধস্তন হবেন।

৮. সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ

৮.১. নিয়োগ পদ্ধতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি এবং ক্রান্তিকালীন বিধান সাপেক্ষে, কোন পদে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের সপ্তম অধ্যায়ের ছক ১ ও ২ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হবে।

৮.২. সরাসরি নিয়োগ

১. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ ব্যতীত, সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিসের কোন প্রবেশ পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ দান কারা যাবে না।

২. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটের প্রবেশ পদ হবে সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং জেলা অ্যাটর্নি ইউনিটের প্রবেশ পদ হবে সহকারি জেলা অ্যাটর্নি। সহাকারি অ্যাটর্নি জেনারেলের ৫০% পদে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরাসরি নিয়োগদান করা হবে।

৩. কোন পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তি অযোগ্য হবেন, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা না হন অথবা, বাংলাদেশে ডমিসাইইল না হন;

(খ) তিনি দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

৪. কোন পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা হবে না, যদি-

(ক) উক্ত পদের জন্য তাঁর নির্ধারিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাঁর বয়স উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়;

(খ) স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রমতে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিক্যাল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতবাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগছেন না যা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে; এবং

(গ) তাঁর পূর্ব কার্যকলাপ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাইয়ের মাধ্যমে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত।

৮.৩. পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ

১. সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাবে।

২. চাকরির বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হলে, কোন ব্যক্তি পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৩. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ

(ক) জেলা অ্যাটর্নি ইউনিটের অন্যূন তিন (৩) বছর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নিগণের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটের সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেলের সর্বোচ্চ ২৫% পদ পূরণ করা যাবে।

(খ) সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটের অন্যূন তিন (৩) বছর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেলগণের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের সর্বোচ্চ ২৫% পদ পূরণ করা যাবে।

(গ) সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটের অন্যূন তিন (৩) বছর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলগণ উক্ত সার্ভিসের অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হবেন।

৮.৪. শিক্ষানবিশদের চাকরিতে স্থায়ীকরণ

১. সার্ভিসের যে কোন শাখার প্রবেশ পদের বিপরীতে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষানবিশের স্তরে যোগদানের তারিখ হতে এক বছরের জন্য শিক্ষানবিশ হিসাবে নিয়োগ করা হবে। তবে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে কোন শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশির মেয়াদ সর্বসাকুল্যে দুই বছরের জন্য বৃদ্ধি করতে পারবে।

২. শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশির মেয়াদ চলাকালে তাঁর আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নয় বা তার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই মনে করলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কারণ প্রদর্শনসহ তাঁর চাকরির অবসান ঘটাতে পারবে।

৩. শিক্ষানবিশির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদসহ (যদি থাকে), পূর্ণ হওয়ার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল তাহলে, তার চাকরি স্থায়ী করবে; এবং

(খ) যদি মনে করে যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহলে, কারণ প্রদর্শনসহ, তার চাকরির অবসান ঘটাতে পারবে।

৪. শিক্ষানবিশদের জন্য যেসব পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে, সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করলে, কোন শিক্ষানবিশকে কোন নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা যাবে না।

৮.৫. অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ

১. সরকার, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল পদের ২০ শতাংশ পদ, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করতে পারবে।

২. চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেলণ সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিসের কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হবেন না।

৮.৬. কর্মস্থল নির্ধারণ, বদলি, ইত্যাদি

১. উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রিকরণের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটের অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেলগণ আন্তঃআদালত বদলিযোগ্য হবেন। তবে সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত অ্যাটর্নিগণ, তাদের সম্মতি ব্যতীত, বদলিযোগ্য হবেন না।

২. জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের বিভিন্ন পদে কর্মরত অ্যাটর্নিগণ আন্তঃজেলা বদলিযোগ্য হবেন। তবে জেলা অ্যাটর্নি ইউনিটের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত অ্যাটর্নিগণ, তাদের সম্মতি ব্যতীত, বদলিযোগ্য হবেন না।

৮.৭. জেলা অ্যাটর্নি ইউনিট থেকে সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটে বদলি

১. জেলা অ্যাটর্নি ইউনিটের জেলা অ্যাটর্নিকে সরকার, সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটের সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে বদলি করতে পারবে।

২. জেলা অ্যাটর্নি ইউনিটের স্বীয় পদে অন্যূন এক (১) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নিকে সরকার, সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটের সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে বদলি করতে পারবে।

৩. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটের সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেলের পদের সর্বোচ্চ ২৫% ভাগ জেলা অ্যাটর্নি ইউনিটের জেলা অ্যাটর্নি ও অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নিগণের মধ্য থেকে বদলির মাধ্যমে পূরণ করা যাবে।

৪. **সার্ভিস হতে প্রেষণে নিয়োগ:** সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিসের যে কোন শাখা হতে অ্যাটর্নিগণকে সরকার অন্যত্র সমপর্যায়ভুক্ত পদে সাময়িকভাবে প্রেষণে নিয়োগদান করতে পারবে।

৮.৮. সুপ্রীম কোর্ট শাখায় স্থায়ী নিয়োগ

১. সরকার, সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটের সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদের ৫০% পদে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরাসরি স্থায়ী নিয়োগদান করবে।

২. সরকার, সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটের সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদের ২৫% পদ জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের যুগ্ম জেলা অ্যাটর্নিগণ হতে পদোন্নতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে, পূরণ করবে।

৩. সরকার, সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটের সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদের ২৫% পদ জেলা অ্যাটর্নি সার্ভিসের জেলা অ্যাটর্নি ও অতিরিক্ত জেলা অ্যাটর্নিগণ হতে বদলির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে, পূরণ করবে।

৯. চাকরির শর্তাবলি

৯.১. চাকরির সাধারণ শর্তাবলি

১. প্রজাতন্ত্রের অসামরিক পদে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জ্যেষ্ঠতাসহ চাকরির অন্যান্য শর্তাবলি, সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

২. সরকার আইন দ্বারা অ্যাসিস্ট্যান্স টু জাস্টিস কমিশন (Assistance to Justice Commission) প্রতিষ্ঠা করবে। উক্ত কমিশনের সুপারিশ ব্যতীত সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিসের কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

৯.২. বেতন, ভাতা, ইত্যাদি

সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন, ভাতা, ছুটি, ভবিষ্য তহবিল, পেনশন ও চাকরির অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন, আদেশ ও বিধিমালা সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৯.৩. অবসর গ্রহণের সময়সীমা

১. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি সার্ভিস এবং জেলা অ্যাটর্নি ইউনিটের বিভিন্ন অ্যাটর্নি পদে সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ৬৫ বছর বয়স হলে চাকরি হতে অবসরপ্রাপ্ত হবেন।

২. অ্যাটর্নি জেনারেল এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্তির কোন নির্ধারিত বয়সসীমা থাকবে না।

১০. ক্রান্তিকালীন বিধান

১০.১. সুপ্রীম কোর্ট অ্যাটর্নি ইউনিটে বিশেষ নিয়োগ

১. সুপ্রীম কোর্টে আইন পেশায় অন্যূন ২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীগণ অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে এবং অন্যূন ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীগণ ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে, এককালীন সরাসরি নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন।

২. এককালীন সরাসরি নিয়োগ লাভে আগ্রহী প্রার্থীর বয়স আবেদন দাখিলের নির্ধারিত শেষ দিনে-
(ক) অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল পদের ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব ৫৫ বছর; এবং
(খ) ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদের ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব ৫০ বছর, হতে হবে।

৩. কোন ব্যক্তি এককালীন সরাসরি নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন না, যদি তিনি -
(ক) বাংলাদেশের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা না হন অথবা, বাংলাদেশে ডমিসাইইল না হন;
(খ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করেন অথবা বিয়ে করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নন।

৪. কোন পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা হবে না, যদি-
(ক) উক্ত পদের জন্য তাঁর ছক - ১ এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং তাঁর বয়স উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়;
(খ) স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রমতে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিক্যাল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতবাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগছেন না যা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

(গ) তাঁর পূর্ব কার্যকলাপ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাইয়ের মাধ্যমে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত।

৫. জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ

(ক) একই পদে একাধিক ব্যক্তিকের নিয়োগদান করা হলে, আইন পেশায় যিনি জ্যেষ্ঠতর ছিলেন, তিনিই জ্যেষ্ঠতর হবেন।

(খ) কোন পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই তারিখে আইন পেশায় যোগদান করে থাকলে, বয়সের জ্যেষ্ঠতা দ্বারা উক্ত পদে তাঁদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে।

(গ) পরবর্তী পর্যায়ে কোন পদে বাছাইয়ের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, পূর্ববর্তী পর্যায়ে নিয়োগকৃক কোন ব্যক্তি অপেক্ষা বয়সে অথবা আইন পেশায় জ্যেষ্ঠতর হওয়ার কারণে, উক্ত পদে পূর্ববর্তী পর্যায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠতর হবেন না।

৬. কোন পদে নিয়োগ লাভের জন্য আবেদনকারীদের মধ্যে কেউ ইতোপূর্বে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল বা সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে দায়িত্ব পালন করে থাকলে, উক্ত পদে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে উক্ত অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭. নিয়োগ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন নির্ধারিত পদ্ধতি ও নীতিমালা অনুসরণ করে প্রার্থী বাছাই করবে এবং সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করবে।

৮. বিশেষ ব্যবস্থায় অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল বা সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেলের নির্ধারিত সংখ্যক পদে একবারে কিংবা পর্যায়ক্রমে সরাসরি নিয়োগ দান করা যাবে।

৯. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকতাদের জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নিয়োগ প্রদান করবে।

১০. সরকার, বিশেষ ব্যবস্থায় নিযুক্ত অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল বা সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেলকে তাদের মূল বেতনের সঙ্গে অতিরিক্ত যথাক্রমে ১০০ শতাংশ, ৭৫ শতাংশ এবং ৫০ শতাংশ হারে বিশেষ ভাতা প্রদান করতে পারবে।

১১. সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন কার্যকর হওয়ার দুই বছর পর বিশেষ ব্যবস্থায় কোন নিয়োগদান করা যাবে না।

১০.২. জেলা অ্যাটর্নি ইউনিটে বিশেষ নিয়োগ

১. বাংলাদেশে আইন পেশায় অন্যূন ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীগণ জেলা অ্যাটর্নি পদে, অন্যূন ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীগণ অতিরিক্ত জেলা-অ্যাটর্নি পদে, অন্যূন ৭ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীগণ যুগ্ম জেলা-অ্যাটর্নি পদে, এবং অন্যূন ৪ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবীগণ সিনিয়র সহকারি জেলা অ্যাটর্নি পদে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে, এককালীন সরাসরি নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন।

২. এককালীন সরাসরি নিয়োগ লাভে আগ্রহী প্রার্থীর বয়স আবেদন দাখিলের নির্ধারিত শেষ দিনে-

(ক) জেলা-অ্যাটর্নির ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব ৫৪ বছর;

(খ) অতিরিক্ত জেলা-অ্যাটর্নির ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর;

(গ) যুগ্ম জেলা-অ্যাটর্নির ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব ৪২ বছর; এবং

(ঘ) সিনিয়র সহকারি জেলা-অ্যাটর্নির ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব ৩৮ বছর।

৩. কোন ব্যক্তি এককালীন সরাসরি নিয়োগের জন্য যোগ্য হবেন না, যদি তিনি -

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা না হন অথবা, বাংলাদেশে ডমিসাইইল না হন;

(খ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করেন অথবা বিয়ে করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নন।

৪. কোন পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা হবে না, যদি-

(ক) উক্ত পদের জন্য তাঁর ছক - ২ এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং তাঁর বয়স উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়;

(খ) স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রমতে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিক্যাল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি

স্বাস্থ্যগতবাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগছেন না যা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

(গ) তাঁর পূর্ব কার্যকলাপ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাইয়ের মাধ্যমে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত।

৫. জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ

(ক) একই পদে একাধিক ব্যক্তিকের নিয়োগদান করা হলে, আইন পেশায় যিনি জ্যেষ্ঠতর ছিলেন, তিনিই জ্যেষ্ঠতর হবেন।

(খ) কোন পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই তারিখে আইন পেশায় যোগদান করে থাকলে, বয়সের জ্যেষ্ঠতা দ্বারা উক্ত পদে তাঁদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে।

(গ) পরবর্তী পর্যায়ে কোন পদে বাছাইয়ের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, পূর্ববর্তী পর্যায়ে নিয়োগকৃত কোন ব্যক্তি অপেক্ষা বয়সে অথবা আইন পেশায় জ্যেষ্ঠতর হওয়ার কারণে, উক্ত পদে পূর্ববর্তী পর্যায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠতর হবেন না।

৬. কোন পদে নিয়োগ লাভের জন্য আবেদনকারীদের মধ্যে কেউ ইতোপূর্বে গভর্নমেন্ট প্লিডার, সহকারি গভর্নমেন্ট প্লিডার, লোকাল গভর্নমেন্ট প্লিডার, পাবলিক প্রসিকিউটর, স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর বা সহকারি পাবলিক প্রসিকিউটর পদে দায়িত্ব পালন করে থাকলে, উক্ত পদে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে উক্ত অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭. নিয়োগ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন নির্ধারিত পদ্ধতি ও নীতিমালা অনুসরণ করে প্রার্থী বাছাই করবে এবং সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করবে।

৮. বিশেষ ব্যবস্থায় জেলা-অ্যাটর্নি, অতিরিক্ত জেলা-অ্যাটর্নি এবং যুগ্ম জেলা-অ্যাটর্নি এবং সিনিয়র সহকারি জেলা-অ্যাটর্নির নিধারিত সংখ্যক পদে একবারে কিংবা পর্যায়ক্রমে সরাসরি নিয়োগ দান করা যাবে।

৯. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকতাদের জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নিয়োগ প্রদান করবে।

১০. সরকার, এই ধারার অধীন বিশেষ ব্যবস্থায় নিযুক্ত জেলা-অ্যাটর্নি, অতিরিক্ত জেলা-অ্যাটর্নি এবং যুগ্ম জেলা-অ্যাটর্নিকে তাদের মূল বেতনের সাথে অতিরিক্ত যথাক্রমে ১০০ শতাংশ, ৭৫ শাতাংশ এবং ৫০ শতাংশ হারে বিশেষ ভাতা প্রদান করবে।

১১. এই অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার দুই বছর পর এই ধারার অধীন বিশেষ ব্যবস্থায় কোন নিয়োগদান করা যাবে না।

১১. বেসরকারি পরামর্শক নিয়োগ

১. সরকার, প্রয়োজনে, নিধারিত শর্তে, যে কোন আদালতে সরকারের পক্ষে কোন নির্দিষ্ট মামলার প্রস্তুতি ও পরিচালনায় পরামর্শ প্রদানের জন্য বেসরকারি পরামর্শক নিয়োগ করতে পারবে।

২. পরামর্শক উল্লিখিত মামলার পক্ষে বা বিপক্ষে আদালতে বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন না।

৩. সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীতআইন কার্যকর হওয়া পাঁচ বছর পর কোন বেসরকারি পরামর্শক নিয়োগদান করা যাবে না।

১২. সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ

সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন বা উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তার জন্য সরকার বা সার্ভিসের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাবে না।

১৩. সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিসের বাৎসরিক প্রতিবেদন

১. মহা-পরিচালক প্রতি ক্যালেন্ডার বছর শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে সার্ভিসের একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন তৈরি করে জাতীয় সংসদ, আইন ও বিচার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রধান বিচারপতিকে প্রেরণ করবে।

২. উক্ত প্রতিবেদনে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে:
   (ক) সরকার পক্ষ এইরূপ দেওয়ানি, ফৌজদারি ও অন্যান্য মামলার জেলা ভিত্তিক শ্রেণিকৃত পরিসংখ্যান;
   (খ) বিভিন্ন ফৌজদারি আইনে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্তদের শ্রেণিকৃত পরিসংখ্যান;
   (গ) অ্যাটর্নিগণের পরামর্শে সংশোধিত অভিযোগের সংখ্যা;
   (ঘ) অ্যাটর্নিগণের পরামর্শে প্রত্যাহারকৃত এবং সংযোজিত অভিযোগের সংখ্যা;
   (ঙ) জিআর ও সিআর মামলার পরিসংখ্যান;
   (চ) বিভিন্ন ধরনের ফৌজদারি মামলার বিচার সম্পন্ন হইতে অতিক্রান্ত সময়;
   (ছ) সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিসের বিভিন্ন পদে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পরিসংখ্যান;
   (জ) সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস আইন ও বিধিমালার বিভিন্ন প্রায়োগিক সমস্যা।

১৪. আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইন সংশোধন

১. একটি আইন বা অধ্যাদেশ দ্বারা সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হবে। সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা, উক্ত সার্ভিসে নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ এবং উক্ত সার্ভিসকে কার্যকর করার জন্য যাবতীয় বিধান, যতদূর সম্ভব, মূল আইনেই অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২. সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন/অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করবে।

৩. সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা এবং এই আইন বাস্তবায়নের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এবং অন্যান্য যেসব আইনে পাবলিক প্রসিকিউটর কিংবা পাবলিক প্লিডারের উল্লেখ আছে সেসব আইনে সংশোধনী আনা হবে।

৪. The Bangladesh Law Officers Order, 1972 (P. O. No. 6 of 1972) রহিত করা হবে। রহিত করা হলেও, উক্ত রহিত আইনের অধীন নিযুক্ত কোন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং সহকারি অ্যাটর্নি-জেনারেল, বিশেষ আদেশ দ্বারা নিজ নিজ পদ হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, নিজ নিজ পদে, সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন কার্যকর হওয়ার পরবর্তী দুই বছর পর্যন্ত, নিয়োগের সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত শর্তে বহাল থাকবেন।

৫. সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও, বর্তমান ব্যবস্থায় নিযুক্ত গভর্নমেন্ট প্লিডার, সহকারি গভর্নমেন্ট প্লিডার, লোকাল গভর্নমেন্ট প্লিডার, পাবলিক প্রসিকিউটর, স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর বা সহকারি পাবলিক প্রসিকিউটরগণ, বিশেষ আদেশ দ্বারা নিজ নিজ পদ হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, নিজ নিজ পদে, উক্ত আইন কার্যকর হওয়ার পরবর্তী তিন বছর পর্যন্ত, নিয়োগ সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত শর্তে বহাল থাকবেন।

৬. সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিস অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, ছক - ১ ও ছক - ২ এ বর্ণিত শর্তাবলি সংশোধন করতে পারবে।

৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে যা ইতোমধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনকে অবহিত করা হয়েছে।

৮. ক্রান্তিকালীন পর্যায়ে কর্মরত পিপি-জিপিগণ এবং অ্যাটর্নি সার্ভিসে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য অবিলম্বে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দকরণ ও অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা এবং স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিসের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে অবকাঠামো নির্মাণ।

অষ্টম অধ্যায়: রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন

১. বর্তমান আইনি বিধান

বর্তমানে দণ্ড মার্জনা, দণ্ড মওকুফ, দণ্ড হ্রাস, দণ্ড স্থগিত এবং দণ্ড বিলম্বের বিষয়গুলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ এবং ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১, ৪০২ ও ৪০২ক ধারা অনুসারে পরিচালিত হয়।

২. ক্ষমা প্রদর্শন ক্ষমতার রাজনৈতিক ব্যবহার

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকার যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতার অপব্যবহার করছে তা সর্বজনবিদিত। রাজনৈতিক বিবেচনায় বিচার কাজ শেষ হওয়ার আগেই ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে, একই অপরাধীকে দুইবার ক্ষমা প্রদর্শনের ঘটনাও ঘটেছে। ক্ষমা প্রদর্শনের এই ঘটনাগুলো আমাদের দেশে আইনের শাসনের ধারণাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

৩. সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:

৩.১ আইন প্রণয়ন

১. ক্ষমা প্রদর্শন আইন নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হবে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ অন্যান্য সব নির্বাহী ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা এই আইনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হবে।

২. ক্ষমা প্রদর্শন আইনের মাধ্যমে একটি ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ড গঠিত হবে। বোর্ডের গঠন নিম্নরূপ হবে:

ক্রম	ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ডের সদস্য	সদস্যের ধরন
১.	অ্যাটর্নি জেনারেল	চেয়ারম্যান
২.	জাতীয় সংসদ কর্তৃক মনোনীত সরকার দলীয় একজন সংসদ সদস্য	সদস্য
৩.	জাতীয় সংসদ কর্তৃক মনোনীত বিরোধী দলীয় একজন সংসদ সদস্য	সদস্য
৪.	মহা কারা পরিদর্শক	সদস্য
৫.	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন সিভিল সার্জন	সদস্য
৬.	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন মনোবিদ	সদস্য

৩. সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, গঠিত ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ডের সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করবে।

৪. ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ড বছরে ন্যূনতম দুইবার, জানুয়ারি ও জুলাই মাসে, সভায় মিলিত হবে। সরকার বোর্ডের সভা অনুসারে সদস্যদের জন্য সম্মানীর ব্যবস্থা করবে।

৫. আগ্রহী দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি নির্ধারিত ফরমে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বরাবরে ক্ষমা প্রদর্শনের আবেদন করবেন। সকল আবেদন যাচাই-বাছাই করে অ্যাটর্নি জেনারেল ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ডের সভা আহবান করবেন।

৬. ক্ষমা প্রাপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণে বোর্ড একমত না হতে পারলে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

৭. গৃহীত সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি বা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী দপ্তরকে অবহিত করা হবে।

৮. বোর্ডের গৃহীত সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি বা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী বিভাগ ক্ষমা প্রদর্শন করবে।

৩.২ সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতি

ক্ষমা প্রদর্শনের সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে বোর্ড নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করবে:

১. অনুকম্পা প্রদর্শন একটি বিশেষ সাংবিধানিক ক্ষমতা তাই অত্যন্ত বিরল এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রেই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে;
২. অপরাধের মাত্রা ও ধরন;
৩. ভুক্তভোগী এবং সার্বিকভাবে সমাজের উপর সংশ্লিষ্ট অপরাধের প্রভাব;
৪. দণ্ড প্রদানের পরে অপরাধীর আচরণ আমলে নিতে হবে;
৫. অপরাধী আদালতে দোষ স্বীকার করেছে কিনা দেখতে হবে;
৬. অপরাধী তার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত কিনা জানতে হবে (আচার আচরণ থেকে);
৭. যেখানে শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে সেখানে অপরাধী কারাদণ্ডের কতটুকু ভোগ করেছে এবং কতটুকু বাকি আছে;
৮. অপরাধীর বয়স এবং সার্বিক বিবেচনায় তার সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল;
৯. অপরাধী শারীরিক বা মানসিক রোগাক্রান্ত হলে তার ধরন;
১০. জনমত;
১১. ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে বা না করা হলে তার কারণ জানাতে হবে।

৩.৩ ক্ষমা প্রার্থনার আবেদনের ফরম

আবেদনকারী নির্ধারিত ফরমে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করবে।

৩.৪ সংবিধান সংশোধন

অনুচ্ছেদ ৪৯ সংশোধন করে ক্ষমা প্রদর্শন বোর্ডের বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র এ উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন ও বিধি অনুসরণ করেই ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন[২২]।

[২২] দশম অধ্যায় দেখুন।

নবম অধ্যায়: স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস

১. ভূমিকা: বিচার ব্যবস্থায় তদন্ত প্রক্রিয়ার যথাযথ ভূমিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি স্বতন্ত্র, কার্যকর, দক্ষ, নির্ভরযোগ্য, জনবান্ধব এবং প্রভাবমুক্ত তদন্ত সার্ভিস গঠন প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে।

২. স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সংস্থার ধারণাটি নতুন নয়: ১৯৯৬ সালের আইন কমিশন আইনের ৬ ধারায় উক্ত আইনের অধীনে গঠিত আইন কমিশনের কার্যাবলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উক্ত আইনের ৬। (ক) ধারার দফা (৬) অনুসারে আইন কমিশনের বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্যে একটি হলো:

> "ফৌজদারি মামলার অভিযোগ তদন্ত করিবার জন্য স্বতন্ত্র তদন্তকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠার এবং সরকারের পক্ষে বিভিন্ন মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি অধিকতর দক্ষ এবং জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা যাচাই করতঃ তৎসম্পর্কে গ্রহণীয় পদক্ষেপের সুপারিশ" করা।

উক্ত আইন প্রণয়নের প্রায় ৩০ বছর অতিক্রান্ত হলেও আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে এই ধরনের একটি স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সংস্থা গঠনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নি।

৩. প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

১ তদন্ত সংস্থায় নিয়োজিত জনবলের সমন্বয়ে একটি পৃথক তদন্ত সার্ভিস গঠিত হবে, যার নাম হবে ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস (Criminal Investigation Service)। এই সার্ভিস হবে পুলিশ বাহিনী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের নিয়োগ, চাকরির শর্তাবলি, নিয়ন্ত্রণ, বাজেট, অবকাঠামো ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি একটি স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোভুক্ত হবে।

২ তদন্ত সার্ভিস ও পুলিশ বাহিনীর দায়িত্বের বিভাজন নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পুলিশের সহায়তা প্রয়োজন হয় এমন যে কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়ার এবং সাধারণভাবে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে দায়িত্ব থাকে পুলিশের উপর।

৩ সাধারণত কোনো মামলা দায়ের হওয়ার পরই কেবল তদন্ত সার্ভিস কাজ শুরু করবে। তবে জরুরি ক্ষেত্রে এবং ঘটনার জটিলতা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে পুলিশ আনুষ্ঠানিক মামলা দায়েরের পূর্বেও সম্ভাব্য তদন্তের অংশ হিসাবে তদন্ত সার্ভিসের সহায়তা নিতে পারবে।

৪ কোনো মামলার তদন্ত শুরুর প্রথম পর্যায় থেকেই তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট অ্যাটর্নি/প্রসিকিউটরের তদারকিতে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৫ উপরে বর্ণিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রচলিত পুলিশ বিভাগ ও তদন্ত সার্ভিসের কাজের সুনির্দিষ্ট বিভাজন থাকবে। সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন এবং যথাযথ বিধান সম্বলিত নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৪. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস (Criminal Investigation Service) গঠন

১. সরকার আইন দ্বারা ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস গঠন করবে।

২. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস সাধারণত উহার থানা পর্যায়ের অফিসে তদন্ত পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবে।

৩. দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা ব্যবহারে সার্ভিস স্বাধীন থাকবে।

৪. উক্ত আইনে একটি তপশিল থাকবে। উক্ত তফশিলে বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে সংজ্ঞায়িত অপরাধের শ্রেণিকৃত তালিকা থাকবে এবং আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাই বলা থাকুক না কেন, ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের বিশেষায়িত ইউনিটগুলো তফশিলভুক্ত উক্ত অপরাধ এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা বা ষড়যন্ত্র বা উক্ত অপরাধ সংঘটনের সহায়তার তদন্ত ও অনুসন্ধান করবে।

৫. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের একজন মহাপরিচালক (ডিরেক্টর জেনারেল) থাকবেন এবং সরকার উক্ত তদন্ত সার্ভিসে প্রয়োজন অনুসারে কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ দান করবে।

৬. বাংলাদেশ পুলিশের যেসব কর্মকর্তা সার্ভিসের সদস্য হিসেবে আত্মীকৃত হবেন তাদের পরবর্তীতে পুলিশ বিভাগে প্রেষণে বা অন্য কোন ভাবে বদলি করা যাবে না।
৭. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের কোন সদস্য পদোন্নতির মাধ্যমে পরবর্তী পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হলে, উক্ত পরবর্তী পদে পুলিশ বিভাগে থেকে নিয়োগ দান করা যাবে না।

৫. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস পরিচালনার মূলনীতি

অর্পিত দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা ব্যবহারে ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস চারটি নীতি অনুসরণ করবে: সত্য উদঘাটন; মানবাধিকার; আইনি ব্যবস্থার অপব্যবহার প্রতিরোধ; জনস্বার্থ।

৬. সার্ভিসের প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান

১. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের সার্বিক তত্ত্বাবধান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে।
২. ফৌজাদারি তদন্ত সার্ভিসের প্রশাসনিক দায়িত্ব ডিরেক্টর-জেনারেলের (ডিরেক্টর জেনারেল অব ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন সার্ভিস) উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি পুলিশ মহা-পরিদর্শকের সমপর্যায়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেন।

৭. প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয়, জেলা ও থানা কার্যালয়

ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের একটি প্রধান কার্যালয় থাকবে এবং উক্ত কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হবে।

প্রতিটি বিভাগীয় সদরে ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের বিভাগীয় কার্যালয় থাকবে। একজন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল অব ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধান নির্বাহী হবেন। তিনি তাঁর বিভাগের অন্তর্গত সব জেলার তদন্ত কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান করবেন।

প্রতিটি জেলা সদরে ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের জেলা কার্যালয় থাকবে। একজন সুপারিনটেনডেন্ট অব ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন সার্ভিস জেলা কার্যালয়ের প্রধান নির্বাহী হবেন। তিনি উক্ত জেলার প্রতিটি থানার তদন্ত তদারকি করবেন। তিনি প্রতিটি থানায় তদন্তে প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক ও লজিস্টিক সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে একাধিক জেলার ফৌজদারি তদন্ত কার্যক্রম একটি জেলা কার্যালয় থেকে পরিচালনা করা যাবে। এরূপ ক্ষেত্রে একজন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল অব ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন উক্ত জেলা কার্যালয়ের প্রধান নির্বাহী হবেন।

একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট অব ইনভেস্টিগেশন সার্ভিস ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের থানা কার্যালয়ের প্রধান নির্বাহী হবেন। মাঠ পর্যায়ে তদন্ত করবেন থানা কার্যালয়ের সহকারি থানা ইনভেস্টিগেশন অফিসার এবং থানা ইনভেস্টিগেশন অফিসার। ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের ইনটেলিজেন্স ইউনিট তাদেরকে গোয়েন্দা সহায়তা প্রদান করবেন। তদন্ত শেষে থানা ইনভেস্টিগেশন অফিসার (আইন) এর সহায়তায় থানা ইনভেস্টিগেশন অফিসার, প্রাইমা ফেসি কেইস প্রমাণের উপযুক্ত সাক্ষী ও সাক্ষ্য-প্রমাণের নিরিখে চার্জশিট প্রস্তুত করবেন। সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিসের জেলা অ্যাটর্নির সাথে আলোচনাক্রমে চূড়ান্ত চার্জশিট প্রস্তুত করবেন এবং উপযুক্ত আদালতে পেশ করবেন। থানা ইনভেস্টিগেশন অফিসার সংগৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আদালতে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রতিটি থানায় একটি রেকর্ড/এভিডেন্স রুম থাকবে এবং উক্ত কক্ষে প্রতিটি মামলার যাবতীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ ও নথিপত্র ট্যাগসহ সংরক্ষিত থাকবে। ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের প্রতিটি থানা কার্যালয়ে প্রয়োজন অনুসারে কনস্টেবল নিয়োগ দান করা হবে। প্রতিটি থানা কার্যালয়ে ন্যূনতম একজন নারী কনস্টেবল এবং একজন নারী সহকারি থানা ইনভেস্টিগেশন অফিসার/থানা ইনভেস্টিগেশন অফিসার থাকবেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রতিটি থানা কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধাসহ একটি কক্ষ থাকবে।

৮. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের সদস্যদের ক্ষমতা

১. অপরাধ তদন্ত বা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে প্রণীত বা প্রণীতব্য অন্যান্য আইনের বিধান সাপেক্ষে, ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের সদস্যগণ তাদের এখতিয়ারভুক্ত পরিসীমায়, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিসহ বাংলাদেশে বলবৎ অন্য কোন আইনে অর্পিত দায়িত্ব, কর্তব্য ও সুবিধাসহ অনুসন্ধান, গ্রেফতার ও সম্পত্তি জব্দ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেন।
২. গোয়েন্দা ইউনিট ব্যতীত ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের কোন ইউনিটের সদস্যবৃন্দ পেশাগত পোশাক ও পরিচয়পত্র ব্যতীত তদন্ত সার্ভিস-সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবেন না।

৯. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের সদস্য নিয়োগ

১. ফৌজাদারি তদন্ত সার্ভিসের প্রবেশ পদ হবে সহকারি থানা ইনভেস্টিগেশন অফিসার।
২. বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশ ব্যতীত ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসে কোন সদস্য নিয়োগ করা যাবে না।
৩. প্রবেশপদের নির্বাচনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শারীরিক, মানসিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রণীত বিধিমালার মাধ্যমে নির্ধারণ করবে।
৪. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের কর্মকাণ্ডে সহযোগিতার জন্য সার্ভিসের বিভিন্ন কার্যালয়ে প্রয়োজন অনুসারে কনস্টেবল নিয়োগ দান করা হবে।

১০. চাকরির শর্তাবলি

১. প্রজাতন্ত্রের অসামরিক পদে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জ্যেষ্ঠতাসহ চাকরির অন্যান্য শর্তাবলি, ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।
২. সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন, ভাতা, ছুটি, ভবিষ্য তহবিল, পেনশন ও চাকরির অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন, আদেশ ও বিধিমালা ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।
৩. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসে পদোন্নতি হবে শূন্য পদের ভিত্তিতে। পদোন্নতিতে মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রাধান্য পাবে।
৪. সরকার আইন দ্বারা অ্যাসিস্ট্যান্স টু জাস্টিস কমিশন (Assistance to Justice Commission) প্রতিষ্ঠা করবে। উক্ত কমিশনের সুপারিশ ব্যতীত ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

১১. ফরেনসিক ল্যাব

কমিশন বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগে একটি করে ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করবে। প্রতিটি ল্যাবে বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যের ফরেনসিক বিশ্লেষণের ব্যবস্থা থাকবে, যেমন: হস্তরেখা ও পদচিহ্ন, হাতের লিখা, ব্যালিস্টিক ও জিএসআর, দলিল পরীক্ষা, ট্রেইস এভিডেন্স এনালাইসিস, ডিজিটাল ফরেনসিক্স, ডিএনএ, ফরেনসিক ক্যামিস্ট্রি এবং ভিসেরা, ফরেনসিক মেডিসিন/প্যাথলজি, ফরেনসিক বোটানি, ফটোগ্রাফি এবং ক্রাইম সিন ফটোগ্রাফি, ইত্যাদি।

১২. ময়না তদন্ত ও ডাক্তারি পরীক্ষা: প্রতিটি জেলা সদর হাসপাতালে ন্যূনতম একজন ময়না তদন্তকারী বিশেষজ্ঞ থাকবেন। তিনি ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের সদস্য হবেন এবং একজন ক্যারিয়ার ময়না তদন্তকারী হবেন।

১৩. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের বাৎসরিক প্রতিবেদন: ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারেল প্রতি ক্যালেন্ডার বছর শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে সার্ভিসের একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন তৈরি করে জাতীয় সংসদ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অ্যাটর্নি জেনারেল এবং প্রধান বিচারপতিকে প্রেরণ করবেন। উক্ত প্রতিবেদনে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে: (ক) ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস তদন্ত করেছে এরূপ মামলার থানা, জেলা ও বিভাগ-ভিত্তিক শ্রেণিকৃত পরিসংখ্যান; (খ) বিভিন্ন ফৌজদারি আইনে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্তদের শ্রেণিকৃত পরিসংখ্যান; (গ) অ্যাটর্নিগণের পরামর্শে সংশোধিত অভিযোগের সংখ্যা; (ঘ) অ্যাটর্নিগণের পরামর্শে প্রত্যাহারকৃত এবং সংযোজিত অভিযোগের সংখ্যা; (ঙ) জিআর ও সিআর মামলার পরিসংখ্যান; (চ) বিভিন্ন ধরনের ফৌজদারি মামলার বিচার সম্পন্ন হতে অতিক্রান্ত সময়; (ছ) ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, বিধি ও প্রবিধিমালার বিভিন্ন প্রায়োগিক সমস্যা; ইত্যাদি।

১৪. ক্রান্তিকালীন বিধান

১. প্রারম্ভিকভাবে ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের সদস্যদের শূন্য পদে বাংলাদেশ পুলিশের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে বদলির মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে।
২. প্রাথমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ডিবি, সিআইডি ও পিআইবিতে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ অগ্রাধিকার পাবেন।

৩. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন কার্যকর হওয়ার পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুলিশ বাহিনী হতে বদলির মাধ্যমে কোন কর্মকর্তাকে উক্ত সার্ভিসে নিয়োগ দান করা যাবে না।

১৫. সুপারিশকৃত পদক্ষেপঃ

১. এ অধ্যায়ের ৩ থেকে ১৪ অনুচ্ছেদে প্রস্তাবিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করে একটি আইন বা অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকার উক্ত আইন/অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি/প্রবিধিমালা প্রণয়ন করবে।

২. ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠা এবং উক্ত সার্ভিস প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন বাস্তবায়নের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এবং অন্যান্য যেসব আইনে ফৌজাদারি অপরাধ তদন্তের উল্লেখ আছে সেসব আইনে সংশোধনী আনা হবে।

৩. ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন, ১৯৪৩ সালের পুলিশ প্রবিধানমালার সংস্কার আনা হবে।

ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের আঞ্চলিক কাঠামো

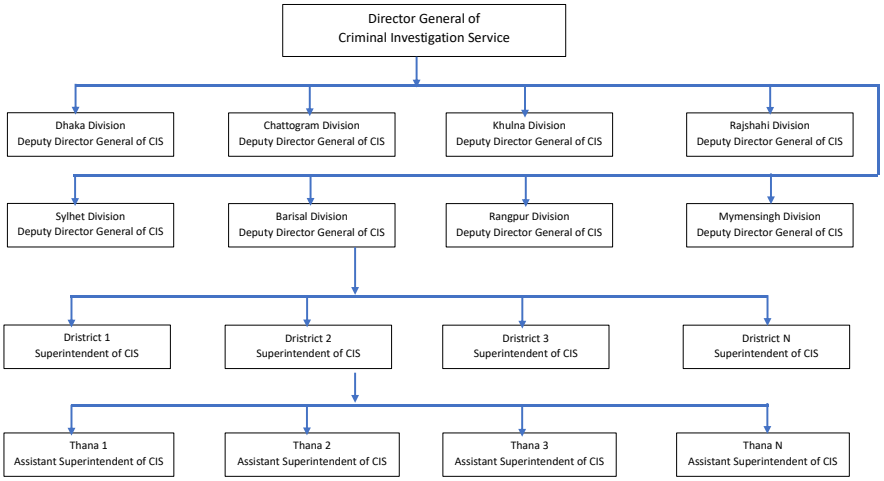

ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের বিভিন্ন অপরাধ ইউনিট

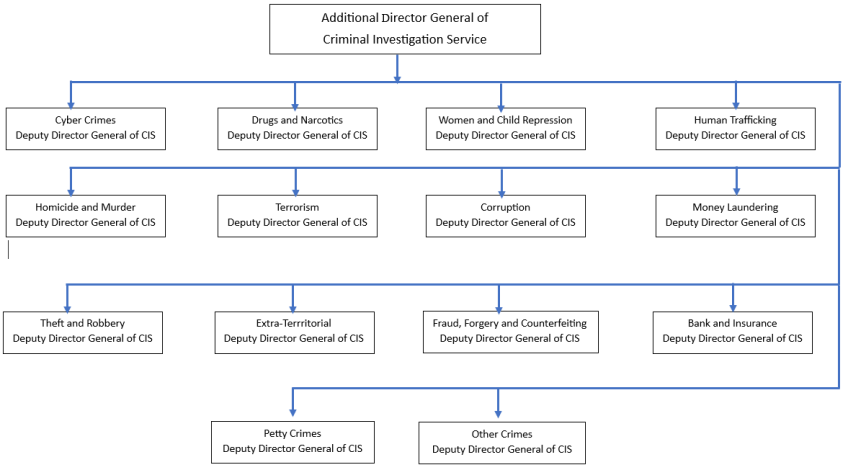

ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিসের প্রশাসনিক কাঠামো

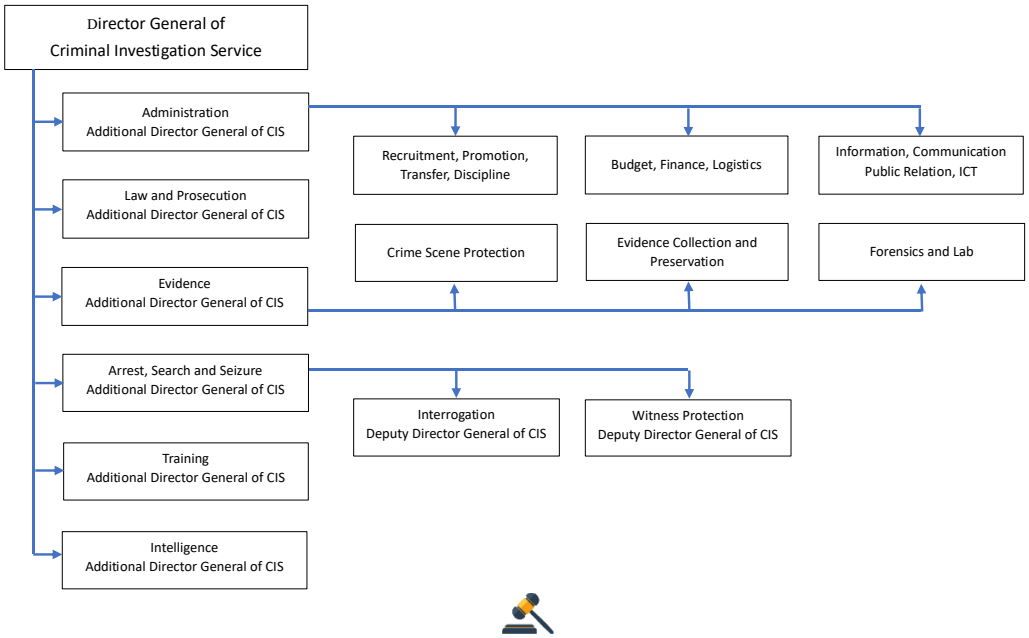

দশম অধ্যায়: বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সংবিধান-সংশোধনী

ভূমিকা: বিদ্যমান সংবিধান ও অন্যান্য আইন, দেশি ও বিদেশি উচ্চতর আদালতের রায়, আইন বিষয়ক বিবিধ তাত্ত্বিক আলোচনা ও পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিল পরীক্ষায় দেখা যায় যে: (ক) বিচার বিভাগের **স্বাধীনতার** তিনটি মূল উপাদান হলোঃ প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, আর্থিক স্বাধীনতা ও বিচারকদের কার্যকালের নিশ্চয়তা; (খ) বিচার বিভাগের **নিরপেক্ষতার** প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিচারকদের অনুরাগ বা বিরাগের বা প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে বিচারকার্য পরিচালনা; (গ) **কার্যকর** বিচার বিভাগের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো স্বচ্ছতার সাথে, সহজলভ্যভাবে, যৌক্তিক সময়ে ও ন্যূনতম খরচে সুবিচার প্রাপ্তি নিশ্চিতের ব্যবস্থা করা। বিচার বিভাগ সম্পর্কে এসব বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্যগুলো অর্জন করার ক্ষেত্রে সংবিধানের ৬ষ্ঠ ভাগে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত কিছু বিধান ও অন্যান্য ভাগের সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন এবং নতুন কিছু বিধান অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে নিম্নে এ বিষয়ে সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব এবং সংক্ষিপ্ত কারণ উপস্থাপন করা হলো:

**** সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:** এই প্রতিবেদনের ৩য় থেকে ৮ম অধ্যায়ে সুপারিশকৃত পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান সংবিধানের ২১ টি অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যথা: ৪৮, ৪৯, ৫৫, ৮৮, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৪, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১৪৭, ১৫২ এবং দুটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করতে হবে, যথা: ৬৪ক ও ৯৫ক। প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি নিম্নরূপ:

বিদ্যমান সংবিধানের প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ

রাষ্ট্রপতি

৪৮। (১) অপরিবর্তিত

(২) অপরিবর্তিত

(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী এবং ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন:

[শর্তাংশ অপরিবর্তিত]

(৪) অপরিবর্তিত

(৫) অপরিবর্তিত

কারণ: সংবিধানের ৬ষ্ঠ ভাগে প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির - তথা নির্বাহী বিভাগের - স্বেচ্ছাধীন বিবেচনার কোন সুযোগ নেই, বরং আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারপতিকেই প্রধান বিচারপতি এবং নিয়োগ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী (প্রস্তাবিত ৯৫ক অনুচ্ছেদের অধীনে) অন্যান্য বিচারপতি পদে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার

৪৯। রাষ্ট্রপতি এতদউদ্দেশ্যে সংসদের আইন দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড ও পদ্ধতি অনুসারে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিতে এবং যে কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিতে পারিবেন।

কারণ: অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত কারণসমূহ দ্রষ্টব্য।

মন্ত্রিসভা

৫৫। (১) অপরিবর্তিত

(২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই সংবিধানের ৬ষ্ঠ ভাগের অধীনে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ, শৃঙ্খলা ও অপসারণ এবং বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা ও অপসারণ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কোনো পরামর্শ প্রদান করিবেন না বা অন্য কোনোভাবে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না।

(৩–৫) অপরিবর্তিত

(৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংবিধানের ৬ষ্ঠ ভাগ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা বা সম্পাদনযোগ্য কার্যাবলি উক্ত বিধিসমূহে অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

কারণ: বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত করার লক্ষ্যে এই সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।

সংবিধানের ৪র্থ ভাগের ৫ম পরিচ্ছেদ এর শিরোনাম সংশোধন

সংবিধানের ৪র্থ ভাগের ৫ম, '৫ম পরিচ্ছেদ-অ্যাটর্নি-জেনারেল' অভিব্যক্তির পর 'ও বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিস' শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

কারণ: এই ভাগে "বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিস" নামে সরকারি আইন কর্মকর্তাদের জন্য একটি স্থায়ী সার্ভিসের গঠন সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিস (বর্তমানে কোনো বিধান নেই)

৬৪ক। (১) এই সংবিধানের ৬৪ অনুচ্ছেদের (২) ও (৩) দফায় উল্লিখিত অ্যাটর্নি-জেনারেল এর দায়িত্ব পালনে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিস নামে একটি কর্মবিভাগ থাকিবে।

(২) উক্ত কর্মবিভাগ এর গঠন, কর্মবিভাগের বিভিন্ন পদে নিয়োগ এবং কর্মের অন্যান্য শর্তাবলি এই সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

কারণ: এই প্রতিবেদনের সপ্তম অধ্যায়ে প্রস্তাবিত বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিস গঠনের যৌক্তিকতা ও এর রূপরেখা উপস্থাপিত হয়েছে এবং এই সার্ভিস প্রতিষ্ঠায় আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। সংবিধানে যেহেতু অ্যাটর্নি-জেনারেল সংক্রান্ত বিধান রয়েছে এবং যেহেতু এই সার্ভিসের উদ্দেশ্য হবে অ্যাটর্নি-জেনারেল এর দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা, সেহেতু সংবিধানে বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিস বিষয়ে একটি সাধারণ বিধান থাকা সমীচীন।

সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়

৮৮। সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে:

(ক) অপরিবর্তিত

(খ) অপরিবর্তিত

(খখ) বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণকে দেয় পারিশ্রমিক;

(গ) সংসদ, সুপ্রীম কোর্ট, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, নির্বাচন কমিশন ~~এবং সরকারী কর্ম কমিশনের~~, সরকারী কর্ম কমিশন এবং বিচার-কর্মবিভাগের কর্মচারিদিগকে দেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয়;

কারণ: বিচার বিভাগের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অধস্তন আদালতের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে অধস্তন আদালতের বিচারক ও কর্মচারিদেরকে প্রদেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয়ের মর্যাদা অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঘ-চ) অপরিবর্তিত

সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা

৯৪। (১) অপরিবর্তিত

(২) প্রধান বিচারপতি (যিনি "বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি" নামে অভিহিত হইবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন গ্রহণের জন্য প্রধান বিচারপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারপতি নিয়োগ করা প্রয়োজন বলিয়া নির্ধারণ করিবেন ও তন্মর্মে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করিবেন সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারপতি লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, আপীল বিভাগে বিচারপতির সংখ্যা হইবে প্রধান বিচারপতিসহ অন্যূন ০৭ (সাত) জন।

(৩) প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারপতিগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারপতি কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করিবেন।

(৪) এই সংবিধানের বিধানাবলি-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতি বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।

(৫) প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি এই সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও অর্পিত দায়িত্ব পালন ছাড়াও এমন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন যাহা কোনো আইন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত এবং যাহা –

(ক) বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত সরাসরি সংশ্লিষ্ট; বা

(খ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না করিয়া জনস্বার্থে পালনযোগ্য।

কারণ: (১) বিদ্যমান বিধানগুলোতে শুধুমাত্র প্রধান বিচারপতিকে "বিচারপতি" ও অন্যান্যদের "বিচারক" বলে অভিহিত করা হয়েছে, যা অসঙ্গতিপূর্ণ। তবে, প্রচলিত রীতি অনুয়ায়ী সুপ্রীম কোর্টের সকল বিচারকই "বিচারপতি" পদবি ব্যবহার করেন। সাংবিধানিক বিধানের উক্ত অসঙ্গতি নিরসনের জন্য সবক্ষেত্রেই "বিচারক" শব্দটিকে "বিচারপতি" শব্দটি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে।

(২) সুপ্রীম কোর্টে বিচারকদের সংখ্যা নির্ধারণের এখতিয়ার নির্বাহী বিভাগের পরিবর্তে প্রধান বিচারপতির উপর অর্পণ করা হয়েছে এবং আপীল বিভাগের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন নিশ্চিত করার জন্য বিচারপতির ন্যূনতম সংখ্যা ০৭ (সাত) নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে (বিস্তারিত আলোচনা ও প্রস্তাবের জন্য তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

(৩) বর্তমানে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টে আসন গ্রহণ করা ছাড়াও আইন অনুসারে বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানের পদে দায়িত্ব পালন করেন, যেমন জুডিসিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, ইত্যাদি। প্রস্তাবিত বিচারপতি নিয়োগ কমিশন-এর গঠন অনুসারে ঐ কমিশনেও প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রীম কোর্টে অন্যান্য বিচারপতি অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। উক্তরূপ দায়িত্ব পালন যাতে সংবিধানসম্মত হয়, সেই লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিচারপতি-নিয়োগ

৯৫। (১) রাষ্ট্রপতি –

(ক) আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করিবেন; এবং

(খ) এই সংবিধানের ৯৫ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগ করিবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসাবে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, যদি –

(ক) তিনি কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাঁহার বয়স অন্যূন ৪৮ (আটচল্লিশ) বৎসর হয়; এবং

(গ) তাঁহার নিম্নবর্ণিত যে কোনো একটি অভিজ্ঞতা থাকে–

(অ) সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী হিসাবে অন্যূন ১৫ (পনের) বছরের প্রকৃত অভিজ্ঞতা; অথবা

(আ) জেলা জজ বা সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় পদে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের কর্ম-অভিজ্ঞতাসহ বিচার-কর্মবিভাগে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতা; অথবা

(ই) বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিসে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে অন্যূন ০৩ (তিন) বৎসরের কর্ম-অভিজ্ঞতাসহ উক্ত সার্ভিসে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

(৩) কোনো ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বিচারপতি হিসাবে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, যদি –

(ক) তিনি হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসাবে অন্যূন ০২ (দুই) বৎসর দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন; এবং

(খ) এই সংবিধানের ৯৫ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ কমিশন হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি হিসাবে নিয়োগের জন্য তাঁহাকে সুপারিশ করে।

(৪) কোনো ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন, যদি তিনি হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বিচারপতিগণের মধ্যে কর্মে প্রবীন হন এবং ৯৫ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ কমিশন আপীল বিভাগের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগের জন্য তাঁহাকে সুপারিশ করে।

কারণঃ তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত কারণসমূহ দ্রষ্টব্য।

৯৫ক। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ কমিশন

(১) সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ও হাইকোর্ট বিভাগে ৯৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে বিচারপতি পদে নিয়োগযোগ্য ব্যক্তিগণকে বাছাই ও সুপারিশ করিবার উদ্দেশ্যে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ কমিশন (যাহা এই অনুচ্ছেদে 'কমিশন' বলিয়া উল্লেখিত) নামে একটি কমিশন থাকিবে, যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে গঠিত হইবেঃ

(ক) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, যিনি কমিশন প্রধান হইবেন;

(খ) আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম ২ (দুই) জন বিচারপতি;

(গ) হাইকোর্ট বিভাগে কর্মে প্রবীণতম এমন ২ (দুই) জন বিচারপতি, যাহাদের মধ্যে একজন হইবেন বিচার-কর্মবিভাগের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং অন্যজন হইবেন অ্যাটর্নি সার্ভিসের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন;

(ঘ) উপদফা (খ) ও (গ) তে উল্লিখিত ৪ (চার) জন বিচারপতি-সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক অনধিক ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য মনোনীত একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অথবা অবসরপ্রাপ্ত অন্য একজন বিচারপতি;

(ঙ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল;

(চ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি;

(ছ) উপদফা (খ) ও (গ)-তে উল্লিখিত ৪ (চার) জন বিচারপতি-সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক অনধিক ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের একজন আইনজীবী।

(২) কমিশনের কোনো পদে সাময়িক শুন্যতা বা কমিশনের গঠনে কোনো ত্রুটির কারণে তৎকতৃর্ক গৃহীত কোনো কার্যক্রম বা সিদ্ধান্তের বৈধতা ক্ষুণ্ন হইবে না অথবা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৩) কমিশনের সভা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কমিশনের কার্যাবলি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় আইন দ্বারা নির্ধারিত হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ আইনের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি, এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ অনুসারে বিধি প্রণয়ন করিবেন।

কারণঃ তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত কারণসমূহ দ্রষ্টব্য।

৯৬। বিচারপতিদের পদের মেয়াদ ও সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল

(১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতি ৭০ (সত্তর) [২৩] বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের নিম্নরূপ বিধানাবলি অনুযায়ী ব্যতীত কোন বিচারপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে না।

(৩) একটি সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল থাকিবে (যাহা এই অনুচ্ছেদে "কাউন্সিল" বলিয়া উল্লেখিত) এবং উহা বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতির মধ্যে পরবর্তী যে দুইজন কর্মে প্রবীণ তাঁহাদের লইয়া গঠিত হইবে ঃ

[২৩] সংবিধানের এই সংশোধনী কার্যকর হওয়ার বিষয়ে সংশোধনী আইনে এই মর্মে বিধান থাকবে যে, অবসরের নতুন বয়সসীমা ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট একটি সময়ে কার্যকর হবে যাতে করে তা শুধুমাত্র সেইসব বিচারপতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, যাঁরা নিয়োগের ন্যূনতম বয়স কার্যকর হওয়ার পর নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিল যদি কোন সময়ে ~~কাউন্সিলের সদস্য এইরূপ কোন বিচারকের~~ প্রধান বিচারপতি ব্যতীত উহার অন্য কোনো সদস্যের সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করেন, অথবা কাউন্সিলের কোন সদস্য যদি অনুপস্থিত থাকেন অথবা অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন কারণে কার্য করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে কাউন্সিলের যাঁহারা সদস্য আছেন তাঁহাদের পরবর্তী যে বিচারপতি কর্মে প্রবীণ তিনিই উক্ত সদস্যের স্থলাভিষিক্ত হইবেন ~~অনুরূপ সদস্য হিসাবে কার্য করিবেন~~ ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, কাউন্সিল যদি কোন সময়ে প্রধান বিচারপতির সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করেন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অথবা আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপতি উক্ত তদন্তের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির স্থলাভিষিক্ত হইবেন।

(৪) কাউন্সিলের দায়িত্ব হইবে-

(ক) বিচারপতিগণের জন্য পালনীয় আচরণ বিধি নির্ধারণ করা ;

(খ) বিচারপতি নহেন কিন্তু সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে বিচারপতিদের ন্যায় একই পদ্ধতিতে যে ব্যক্তি স্বীয় পদ হইতে অপসারণযোগ্য, তাঁহার জন্য পালনীয় আচরণবিধি নির্ধারণ করা;

(গ) সাবেক বিচারপতিগণের জন্য পালনীয় আচরণ বিধি নির্ধারণ করা; এবং

(ঘ) কোন বিচারপতির অথবা উপদফা (খ) তে উল্লিখিত অন্য কোনো ব্যক্তির সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা।

(৫) যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বা অন্য কোন সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কাউন্সিলের এইরূপ অভিমত পোষণ করিবার কারণ থাকে যে দফা ৪ এর উপদফা (ক) তে উল্লিখিত কোনো বিচারপতি বা (খ) তে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি –

(ক) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতে অযোগ্য হইয়া পড়িতে পারেন, অথবা

(খ) গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইতে পারেন, অথবা

(গ) কোনো সাবেক বিচারপতি তাঁহার জন্য পালনীয় আচরণবিধি লংঘন করিয়াছেন,

সেইক্ষেত্রে কাউন্সিল বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করিতে ও উহার তদন্ত ফল রিপোর্ট আকারে জ্ঞাপন করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৬) ~~কাউন্সিল~~ তদন্ত করিবার পর কাউন্সিল যদি রাষ্ট্রপতির নিকট ~~যদি~~ এইরূপ রিপোর্ট করেন যে, উহার মতে দফা (৪) এর উপদফা (ক) বা (খ)-তে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি তাঁহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইয়াছেন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিবেন।

(৬ক) তদন্ত করিবার পর কাউন্সিল যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এইরূপ রিপোর্ট করেন যে, উহার মতে কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তাঁহার জন্য পালনীয় আচরণবিধি লংঘন করিয়াছেন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা তাঁহাকে সতর্ক করিতে বা 'বিচারপতি' পদবী ব্যবহার করা হইতে বারিত করিতে পারিবেন।

(৭) এই অনুচ্ছেদের অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্যে, কাউন্সিল বিধি প্রণয়ন করিয়া উহার কার্য-পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন এবং পরওয়ানা জারি ও নির্বাহের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৮) কোন বিচারপতি রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

কারণঃ তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত কারণসমূহ দ্রষ্টব্য।

৯৭। প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রধান বিচারপতি তাঁহার দায়িত্বপালনে অসমর্থ বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে, ক্ষেত্রমত ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা প্রধান বিচারপতি স্বীয় কার্যভার পুনরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত, আপীল বিভাগের অন্যান্য বিচারপতির মধ্যে কর্মে প্রবীণতম বিচারপতি রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসাবে কার্যভার পালন করিবেন।

কারণঃ ৯৫ অনুচ্ছেদের প্রস্তাবিত সংশোধনীর সাথে সামঞ্জস্য রাখার লক্ষ্যে।

সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতিগণ

৯৮। (১) রাষ্ট্রপতি, সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফার বিধানাবলি সত্ত্বেও, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতিরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে আরও এক মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত বিচারপতিরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) কোন ক্ষেত্রে আপীল বিভাগের বিচারপতির সংখ্যা এই সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদের (২) দফায় উল্লিখিত ন্যূনতম সংখ্যা অপেক্ষা হ্রাস পাইলে, অথবা অন্য কোন জরুরি কারণে আপীল বিভাগের বিচারপতির সংখ্যা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন বলিয়া প্রধান বিচারপতির নিকট প্রতীয়মান হইলে, তিনি সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের (৪) দফার বিধানাবলি সত্ত্বেও হাইকোর্ট বিভাগের কর্মে প্রবীণতম এক বা একাধিক বিচারপতিকে অনধিক ০৩ (তিন) মাসের জন্য অস্থায়ীভাবে আপীল বিভাগে আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে অস্থায়ীভাবে আসন গ্রহণকারী বিচারপতি মেয়াদান্তে পুনরায় হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করিবেন।

কারণ: বিচারপতি নিয়োগ সংক্রান্ত ৯৫ অনুচ্ছেদের প্রস্তাবিত সংশোধনীর সাথে সামঞ্জস্য রাখার লক্ষ্যে।

অবসর গ্রহণের পর বিচারপতিগণের অক্ষমতা

৯৯। (১) প্রধান বিচারপতি, আপীল বিভাগের কোনো বিচারপতি বা হাইকোর্ট বিভাগের কোন স্থায়ী বিচারপতি অবসর গ্রহণের বা পদত্যাগ করিবার পর কোন আদালত বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিবেন না অথবা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় পদে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে অথবা বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত সরাসরি সংশ্লিষ্ট কোনো দায়িত্ব পালনে এই দফার কোনো কিছুই তাঁহাদেরকে নিবৃত্ত করিবে না।

(২) দফা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বিচারপতি পদ হইতে অপসারিত হইবার বা অবসর গ্রহণের বা পদত্যাগ করিবার পর আপীল বিভাগে ওকালতি বা কার্য করিতে পারিবেন।

কারণ:

(১) বিদ্যমান বিধানে পদত্যাগের উল্লেখ না থাকায় যে অসংগতি তৈরি হয়েছে তা নিরসনের লক্ষ্যে।

(২) প্রস্তাবিত ৯৪ অনুচ্ছেদের (৫) দফার সাথে সামঞ্জস্য রাখার লক্ষ্যে।

সুপ্রীম কোর্টের আসন ও হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ

১০০। (১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে।

(২) রাজধানীর বাহিরে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে, প্রধান বিচারপতি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হাইকোর্ট বিভাগের এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ থাকিবে।

(৩) প্রত্যেক স্থায়ী বেঞ্চে বিচারপতিগণের আসন গ্রহণ এবং উক্তরূপ আসন গ্রহণের উদ্দেশ্য প্রধান বিচারপতি ১০৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুযায়ী নির্ধারণ করিবেন।

(৪) কোনো স্থায়ী বেঞ্চ বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এমনভাবে এক্তিয়ার প্রয়োগ করিবেন যেন উক্ত বেঞ্চ সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসনে আসন গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদনুসারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার ভিতরে কোন ভৌগলিক সীমারেখা উহার এক্তিয়ার সীমাবদ্ধ করিবে না।

(৫) কোনো স্থায়ী বেঞ্চে কোনো কার্যধারা বিচারাধীন থাকাকালে প্রধান বিচারপতি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বা কোনো আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উহা অন্য কোনো বেঞ্চে স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারিবেন।

(৬) প্রধান বিচারপতি স্থায়ী বেঞ্চসমূহ সম্পর্কিত সকল আনুষঙ্গিক, সম্পূরক বা অনুবর্তী বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিবেন।

(৭) এই অনুচ্ছেদে "বিভাগীয় সদর" বলিতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রশাসনিক বিভাগের সদরকে বুঝাইবে।

কারণ: ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত কারণসমূহ দ্রষ্টব্য।

কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা

১০২।(১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে অথবা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যে কোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলির সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলি বা আদেশাবলি দান করিতে পারিবেন।

(২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে

(ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে অথবা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে -

(অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাঁহার কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া

উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে অথবা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে

(অ) আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) কোন সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপরিউক্ত দফাসমূহে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন অন্তর্বর্তীকালীন বা অন্য কোন আদেশ দানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের থাকিবে না।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (ক) উপ-দফার অধীনে যদি এমন কোনো অন্তর্বর্তী আদেশ প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা হয়, যাহা–

(ক) ~~যেখানে~~ উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন ব্যবস্থা কিংবা কোন উন্নয়নমূলক কার্যের প্রতিকূলতা বা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে; অথবা

(খ) ~~যেখানে~~ অন্য কোনভাবে জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে

তাহা হইলে অ্যাটর্নি-জেনারেলকে উক্ত বিষয় সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত নোটিশদান এবং অ্যাটর্নি-জেনারেলের (কিংবা এই বিষয়ে তাহার দ্বারা ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন এ্যাডভোকেটের) বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত এবং এই দফার (ক) বা (খ) উপ-দফায় উল্লিখিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না বলিয়া হাইকোর্ট বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিভাগ কোন অন্তর্বর্তী আদেশদান করিবেন না।

(৫) প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে "ব্যক্তি" বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং যে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালকে বুঝাইবে, তবে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃংখলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল এবং সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

কারণ:

(১) হাইকোর্ট বিভাগ যাতে কোন আবেদন দায়ের করা ছাড়াও সুবিচারের স্বার্থে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে (Suo Moto) তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে সেই লক্ষ্যে দফা (১) ও (২) এর উপদফা

(ক) ও (খ) তে কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে শব্দগুলির "অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে" শব্দগুলো যোগ করে সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে।
(২) দফা (৪) ও (৫)-এর বিধানের ভাষা সহজবোধ্য করার জন্য সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।

১০৪। আপীল বিভাগের নিকট বিচারাধীন যে কোন মামলা বা বিষয়ে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয় হইতে পারে, উক্ত বিভাগ সেইরূপ নির্দেশ, আদেশ, ডিক্রী বা রীট জারি করিতে পারিবেন এবং এতদউদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির হাজিরা কিংবা কোন দলিলপত্র উদ্ঘাটন বা দাখিল করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
কারণ: ১০৪ অনুচ্ছেদের বিধানকে সহজবোধ্য করার জন্য সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের বিধিপ্রণয়ন-ক্ষমতা
১০৭। (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে, সুপ্রীম কোর্ট ~~রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া~~ প্রত্যেক বিভাগের এবং অধস্তন যে কোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন।
(২) সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীনে প্রণীত বিধিসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্বভার উহার কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারপতিকে অর্পণ করিতে পারিবেন।
(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-সাপেক্ষে কোন্ কোন্ বিচারপতি লইয়া কোন্ বিভাগের কোন্ বেঞ্চ গঠিত হইবে এবং কোন্ কোন্ বিচারপতি কোন্ উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন।
(৪) প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারপতিকে সেই বিভাগে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-দ্বারা অর্পিত যে কোন ক্ষমতাপ্রয়োগের ভার প্রদান করিতে পারিবেন।

কারণ: বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত করার লক্ষ্যে এই সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দফা (২)-এ পূর্বে উল্লিখিত ১১৩ এবং ১১৬ অনুচ্ছেদের উল্লেখ বাদ দেওয়া হয়েছে কারণ ১১৩ অনুচ্ছেদ সংশোধনক্রমে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় এবং ১১৬ অনুচ্ছেদে বিচারকর্ম বিভাগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধানাবলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

"কোর্ট অব রেকর্ড" রূপে সুপ্রীম কোর্ট
১০৮। (১) সুপ্রীম কোর্ট একটি "কোর্ট অব্ রেকর্ড" হইবেন এবং ইহার সকল বিচারিক কার্যক্রমের নথি তৎকর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
(২) 'কোর্ট অব রেকর্ড' হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের দফা (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত বিষয়ে আদালত অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশ বা দণ্ডাদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
(৩) কোনো বিচার কার্যক্রমে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ঘোষিত আইন বা প্রদত্ত সিদ্ধান্ত, আদেশ বা নির্দেশ অমান্য করা বা বাস্তবায়ন না করা বা বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করা বা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা না করা অথবা সুপ্রীম কোর্টে চলমান কোনো বিচারিক কার্যধারাকে বাধাগ্রস্ত করা সুপ্রীম কোর্টের অবমাননা বলিয়া গণ্য হইবে।
(৪) সুপ্রীম কোর্ট দফা (৩) এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত আদালত অবমাননার অন্যান্য ক্ষেত্র, উহার তদন্ত ও বিচারের পদ্ধতি এবং দণ্ডের ধরন ও পরিমাণ বিধিদ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।
কারণ: "কোর্ট অব্ রেকর্ড" এবং আদালত অবমাননার ধারণার স্পষ্টিকরণ ও এ সংক্রান্ত বিধানকে সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে এই সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।

আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ
১০৯। (১) এই সংবিধানের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, আপীল বিভাগের অধস্তন ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থাপনা এবং বিচারিক প্রকৃতির নহে এইরূপ অন্যান্য বিষয়ের ওপরে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা উক্ত বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) এই সংবিধানের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থাপনা এবং বিচারিক প্রকৃতির নহে এইরূপ অন্যান্য বিষয়ের ওপরে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা উক্ত বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

কারণ: সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনাল বিষয়ক তত্ত্বাবধানের প্রকৃতি কেমন হবে তা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে এই সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা

১১১। আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন, সিদ্ধান্ত, আদেশ এবং নির্দেশ হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন, সিদ্ধান্ত, আদেশ বা নির্দেশ অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের জন্য অবশ্যপালনীয় হইবে।

কারণ: অধস্তন আদালতের জন্য অবশ্যপালনীয় বিষয়ের পরিধি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে এই সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা

১১২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ঘোষিত আইন, সিদ্ধান্ত, আদেশ বা নির্দেশ মানিয়া চলিতে এবং উহা প্রয়োগ ও কার্যকর করিতে বাধ্য থাকিবেন।

কারণ: সুপ্রীম কোর্টের সহায়তার পরিধি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে এই সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়

১১৩। (১) এই সংবিধান এবং অন্যান্য আইন দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন এবং বিচার-কর্মবিভাগ সংক্রান্ত বিষয়াবলি পরিচালনার জন্য সুপ্রীম কোর্টের একটি নিজস্ব সচিবালয় থাকিবে যাহা সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের গঠন, কার্যপরিধি, কর্মবণ্টন, বাজেট প্রণয়ন ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহে যেইরূপ নির্ধারিত হইবে, সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের কর্মচারিদের কর্মের শর্তাবলি সেইরূপ হইবে।

কারণ: পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় বিষয়ক প্রস্তাবের আলোকে উপরিউক্ত সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে।

অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

১১৪। আইনের দ্বারা যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সেইরূপ অন্যান্য অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনাল থাকিবে।

কারণ: অন্যান্য বিধানের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে উপরিউক্ত সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিচার-কর্মবিভাগে নিয়োগ ইত্যাদি

১১৫। (১) এই সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ১১৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের বিচারিক কার্যক্রম ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিচার-কর্মবিভাগ নামে একটি বিভাগ থাকিবে।

(২) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেটগণসহ বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যদের নিয়োগ করিবেন।

(৩) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, বিচার-কর্মবিভাগের সহায়ক কর্মচারিদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

কারণঃ *মাসদার হোসেন মামলার* রায়ের আলোকে বিচার-কর্মবিভাগের উপর সুপ্রীম কোর্টের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ বিচার বিভাগের উপর নির্বাহী বিভাগের প্রভাব কমানোর লক্ষ্যে, উপরিউক্ত সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, বিচার-কর্মবিভাগের সহায়ক কর্মচারিদের চাকরির নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের কর্মচারিদের অনুরূপ বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা

১১৬। (১) বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেটগণসহ বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল-নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃংখলাবিধান সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পদোন্নতিদান ও এই সংবিধানের ১৩৫ অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লেখিত দণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

(২) দফা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।

কারণঃ বিচার কর্ম-বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবমুক্তকরণ এবং *মাসদার হোসেন মামলার* রায়ের আলোকে প্রণীত বিধিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে ১১৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন প্রস্তাব করা হয়েছে।

তবে সংশোধিত ১১৬ অনুচ্ছেদ এর আলোকে ইতিপূর্বে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রতিফলন সম্বলিত বিধিমালায় কিছু সংশোধন প্রয়োজন হবে।

কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি

১৪৭। (১) অপরিবর্তিত

(২) অপরিবর্তিত

(৩) অপরিবর্তিত

(৪) এই অনুচ্ছেদ নিম্নলিখিত পদসমূহে প্রযোজ্য হইবে:

(ক–জ) অপরিবর্তিত

(ঝ) বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেটগণসহ বিচার-কর্মবিভাগের সদস্য।

কারণঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরার জন্য অধস্তন আদালতের বিচারকদের পারিশ্রমিকসহ অন্যান্য সুবিধাদির সুরক্ষা প্রদান আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যে এই সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৫২ (১)

...

"বিচারপতি" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের কোন বিচারপতি;

...

"জেলা জজ" বলিতে অতিরিক্ত জেলা জজ অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

কারণঃ প্রচলিত পদবি ব্যবহারের মাধ্যমে সংবিধানের বিধানগুলোকে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে সংজ্ঞাদুটি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়: অধস্তন আদালতের সাংগঠনিক কাঠামো

১.১ মামলা ও বিচারকের বিদ্যমান সংখ্যা

বাংলাদেশে বর্তমানে অধস্তন আদালতের মোট বিচারকের সংখ্যা ২,২৫৪ জন। এর মধ্যে বিভিন্ন কারণে মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত থাকা বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাসহ প্রেষণে কমরত বিচারক রয়েছেন ৩১৯ জন। সুপ্রীম কোর্টের তথ্যমতে বিভিন্ন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত ও ট্রাইব্যুনাল মিলে দেশে বিচারিক কাজে কর্মরত বিচারকের সংখ্যা ১,৯৩৫ জন। অন্যদিকে এই ১,৯৩৫ জন বিচারকের বিপরীতে অধস্তন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৩৮,৩৭,৩২৯টি। নিচে দেশের মামলা সংখ্যা ও বিচারক সংখ্যার একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

অধস্তন আদালতে বিচারিক কাজে কর্মরত বিচারকের সংখ্যা

ক্রম	বিচারকের পদ	বিচারকের সংখ্যা
১	জেলা জজ ও সমপর্যায়ের বিচারক	২৬৩
২	অতিরিক্ত জেলা জজ ও সমপর্যায়ের বিচারক	২৬৬
৩	যুগ্ম জেলা জজ ও সমপর্যায়ের বিচারক	২৯১
৪	সহকারি জজ ও সিনিয়র সহকারি জজ	১১১৫
	মোট	১,৯৩৫

বর্তমানে অধস্তন আদালতে বিচারিক কাজে কমরত বিচারকের সংখ্যা ১,৯৩৫ জন। কর্মরত বিচারকরা যদি প্রতি বছরে ১৩,৩৭,১২৩ টি হারে মামলা নিষ্পত্তি করেন তবে ২০২৩ সালে বিচারাধীন ৩৭,২৯,২৩৫ টি মামলা নিষ্পত্তি করতে তাদের অতিরিক্ত প্রায় ৩ বছর সময় লাগবে। কিন্তু বিচারকের বর্তমান সংখ্যা ও মামলা নিষ্পত্তির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে এই তিন বছরে অন্তত আরো ৪৩ লক্ষ মামলা দায়ের হবে। অর্থাৎ এই দেশের জনসংখ্যা, আদালতের মামলার সংখ্যা এবং মামলা দায়েরের যে গতিপ্রবাহ তার সাথে বিচারকের সংখ্যা আদৌ ভারসাম্যপূর্ণ নয়।

১.২ একজন বিচারককে একাধিক আদালতের দায়িত্ব প্রদানের নেতিবাচক ফল

বাংলাদেশে প্রায়শই দেখা যায় যে, জনস্বার্থে বা জরুরি প্রয়োজনে নতুন আইনের মাধ্যমে নতুন আদালত সৃষ্টি করে বিদ্যমান কোনো আদালতকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উভয় আদালতের মামলার চাপের কারণে দীর্ঘসূত্রিতা বেড়ে যায় এবং সামগ্রিকভাবে মামলা নিষ্পত্তিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

১.৩ আদালতের সাংগঠনিক কাঠামোসহ জনবল পর্যালোচনা

১.৩.১ আদালতের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

কমিশন মনে করে, একটি আদালতের বিচারিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতের জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা অত্যাবশ্যক। অধস্তন আদালতের জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে হবে এবং জনবল বৃদ্ধি করতে হবে। [**সুপারিশকৃত জনবলের সংখ্যা ও বিন্যাস এর জন্য পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।**]

১.৪ কেন্দ্রীভূত আদালত ব্যবস্থা: মেট্রোপলিটন শহরসহ বড় শহরগুলোতে মানুষের দুর্ভোগ

ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন শহরের ব্যাপ্তি বিবেচনায় আদালতে যাতায়াত করা নাগরিকের জন্য ভীষণ অসুবিধাজনক এবং বিড়ম্বনাপূর্ণ। শুধু ঢাকা ও চট্টগ্রাম নয়, অন্যান্য বড় শহরগুলোর কেন্দ্রীভূত আদালত ব্যবস্থা নিয়ে সুচিন্তিত ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। কারণ বিগত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ঢাকাসহ দেশের বড় বড়

মেট্রোপলিটন শহরগুলোতে সরকারি বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণ করা হলেও আদালত ব্যবস্থা স্বাধীনতা-পূর্ব অবস্থা থেকে একই রকম রয়ে গেছে।

এই পরিস্থিতিতে বিচারপ্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য ঢাকা জেলা ও মহানগরীর জেলা ও দায়রা জজ আদালত, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও চিফ মেট্রোপলিটন আদালতকে উত্তর ও দক্ষিণ - এই দু'টি ভাগে বিভক্ত করে উত্তরাংশের বা তার নিকটবর্তী অঞ্চলের আদালতগুলোকে উত্তরা বা মিরপুর অথবা অন্য কোনো নিকটবর্তী স্থানে স্থানান্তর করা প্রয়োজন।
ঢাকার পাশাপাশি দেশের অন্যান্য বিভাগীয় শহর যেমন, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও রংপুরেও আদালত ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার ব্যাপ্তির নিরিখে সেখানে আদালত বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। দেশের অন্যান্য বিভাগীয় শহর যেমন, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও রংপুরেও প্রয়োজন অনুসারে ক্রমান্বয়ে আদালত ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করা যেতে পারে।

১.৫ বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত সংস্কার

১.৫.১ সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস

এনাম কমিটি কর্তৃক প্রণীত সংগঠনিক কাঠামোর পর বিচার বিভাগের জন্য আরও বিভিন্ন ধরনের পদ সৃজিত হয়েছে। একই ধরনের আদালতের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের জনবল নিয়ে আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে জনবল কাঠামোর ভিন্নতা রয়েছে। বর্তমানে ১২৮টি অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ/মহানগর দায়রা জজ এর জন্য গাড়ি TO&E ভুক্ত থাকলেও ৭৩টি অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা/মহানগর দায়রা জজের জন্য গাড়ি TO&E ভুক্ত নেই। পার্বত্য জেলার জজশিপে মাইক্রোবাস TO&E ভুক্ত নেই। বিচার বিভাগের সামগ্রিক সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। একই ধরনের আদালতের জনবল কাঠামো এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জমাদির ধরন একই রকম করা প্রয়োজন।

১.৫.২ সাংগঠনিক কাঠামোতে ১০% সংরক্ষিত পদ সৃজন

ছুটি/প্রেষণ/প্রশিক্ষণের জন্য কোনো বিচারক আদালতের দায়িত্ব পালন করতে না পারলে সেখানে অন্য বিচারককে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়। নিজ আদালতের দায়িত্বের বাইরে অতিরিক্ত আদালতের দায়িত্ব পালনে পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করা সম্ভব হয় না। আদালতের দায়িত্বে পূর্ণকালীন বিচারক না থাকলে বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তি তৈরি হয়। এজন্য ছুটি, প্রেষণ ও প্রশিক্ষণ বাবদ সংরক্ষিত হিসেবে অতিরিক্ত পদ সৃজন করা প্রয়োজন।

১.৬ বিচার বিভাগের পদ সৃজন ও পদ বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

বিচার বিভাগের পদ সৃজন এবং পদ বিন্যাসের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করা প্রয়োজন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মামলার অনুপাতে বিচারক ও আদালতে সংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন উপজেলা প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে নতুন আদালত সৃজন, বিশেষায়িত পৃথক আদালত সৃজন ইত্যাদি।

১.৬.১ জেলা আদালতের বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি

বর্তমানে বিদ্যমান মামলার চাপ, জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য পরিস্থিতি বিবেচনায় একটি দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের জন্য ১,০০০ মামলাকে 'আদর্শ সংখ্যা' বিবেচনা করা যায়। কোনো আদালতে এর অতিরিক্ত মামলা থাকলে একজন বিচারকের পক্ষে কোনোভাবে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়। এ কারণে সারাদেশে বিভিন্ন আদালত ও ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টি করে নতুন করে বিচারক নিয়োগ করা অত্যাবশ্যক।

বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বিবেচনায় জরুরি ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত ছকের ৬ নং কলামে উল্লিখিত সংখ্যক বিচারকের পদ সৃজিত হওয়া প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে:

ক্রমিক	আদালতের নাম	বিচারাধীন মামলার সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ২০২৪)	বিদ্যমান আদালতের সংখ্যা	যে সংখ্যক আদালত থাকা যুক্তিযুক্ত	অতিরিক্ত যে সংখ্যক আদালত সৃষ্টি করা প্রয়োজন
১.	অতিরিক্ত জেলা জজ	২,০৬,৫৯৭	১৭৩	২৫৮	৮৫
২.	যুগ্ম জেলা জজ	৪,৬৬,৫১১	১৫৬	৫৮৩	৪২৭
৩.	সিনিয়র সহকারি জজ ও সহকারি জজ	৯,৯৩,৪৪১	৪৮৭	১২৪২	৭৫৫
৪.	অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট	৯৭,৬০৯	৫৭	১২২	৬৫
৫.	অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট	৪৯,৭৯৩	১১	৬২	৫১
৬.	মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট	২,০৯,৮৯৩	৫৯	২৬২	২০৩
৭.	সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট	৩,৯৫,০০১	২৩৪	৪৯৩	২৫৯
৮.	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট	২,৭৫,৪২২	২৭১	৩৪৪	৭৩
৯.	অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ	৪৯,৭৪৯	২৭	৬২	৩৫
১০.	যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ	১,৭৮,২৭৮	২০	২২২	২০২
১১.	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল	১,৯৪,৮৫২	১০১	২৪৪	১৪৩
১২.	পরিবেশ আদালত	১০,৯৯৩	২	১৪	১২
১৩.	পরিবেশ আপীল আদালত	১৫৯৪	১	২	১
১৪.	শ্রম আদালত	২০,৬৬৩	১২	২৬	১৪
১৫.	ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল	২,৮৯,০১০	৪২	৩৬১	৩১৯
				মোট	২৬৪৪

১.৬.২ অন্যান্য আদালতে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি

১.৬.২.১ সকল মহানগরে 'মহানগর দায়রা আদালত' সৃষ্টি

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও গাজীপুরে মহানগর দায়রা আদালত রয়েছে। অন্যদিকে বরিশাল, রংপুর ও গাজীপুরে মহানগর দায়রা আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য পদ সৃজিত হলেও এখনও উক্ত মহানগরগুলোতে মহানগর দায়রা আদালতের কার্যক্রম পুরোপুরি শুরু হয়নি। এমতাবস্থায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মহানগর দায়রা আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১.৬.২.২ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষায়িত আদালত/ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

মানুষের সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন নতুন আইনে নতুন নতুন আদালত বা ট্রাইব্যুনালর কথা বলা হলেও বাস্তবে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টি না করে ইতোমধ্যে ভারাক্রান্ত বিচারকদের উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে এসব বিশেষায়িত আদালত পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিভিন্ন বিচারকগণকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে এসব আদালত বা ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব অর্পণ করার ফলে বিচারকগণের পক্ষে প্রত্যাশিত সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না। এর ফলে মামলার জট ও মামলার দীর্ঘসূত্রিতা বাড়ছে। এ কারণে সব রকমের জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষায়িত আদালত সৃষ্টি করা সম্ভব না হলেও নিম্নবর্ণিত বিশেষায়িত আদালত বা ট্রাইব্যুনালের জন্য বিচারকসহ পর্যাপ্ত জনবল সৃষ্টি করা প্রয়োজন:

মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা: ২ বছর পর্যন্ত সাজা নির্ধারিত আছে এরূপ ধারার মামলা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এবং সর্বোচ্চ সাজার ধারা সম্বলিত মামলাগুলো বিচারের জন্য মাদকের বিশেষ আদালত গঠন করা প্রয়োজন।

পারিবারিক আদালত ও পারিবারিক আপিল আদালত প্রতিষ্ঠা: এসব আদালতের জন্য পৃথক বিচারকের পদ সৃজন করা প্রয়োজন।

অর্থঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা: বিচারাধীন মামলার সংখ্যা এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি বিবেচনায় বিভাগীয় শহরভুক্ত সকল জেলায় পৃথক অর্থঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি বিবেচনায় নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, কুমিল্লা, কক্সবাজার, বগুড়া এবং যশোরে পৃথক অর্থঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বিবেচনায় ঢাকায় ২০ টি এবং চট্টগ্রাম ৩টি অর্থঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

প্রত্যেক জেলায় স্বতন্ত্র শিশু আদালত প্রতিষ্ঠা: শিশুদের বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করে স্বতন্ত্র শিশু আদালত প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

পরিবেশ আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি: যেসব বিভাগীয় শহরে বর্তমানে পরিবেশ আদালত নেই সেসব বিভাগে পরিবেশ আদালত সৃষ্টি করতে হবে।

পার্বত্য জেলায় পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা: বিচারপ্রার্থী মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ সংশোধনক্রমে ৩ পার্বত্য জেলায় পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা করার আশু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

পৃথক দ্রুত বিচার আদালত প্রতিষ্ঠা: দ্রুত বিচার আদালতের মামলাগুলো বিশেষ প্রকৃতির এবং জনগুরুত্বপূর্ণসম্পন্ন হওয়ায় এগুলো বিচারের জন্য জনবলসহ পৃথক আদালত সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন।

বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠা: খাদ্যে ভেজাল রোধসহ জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্রমবর্ধমান হুমকি বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি জেলায় একটি করে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠা জরুরি।

বন আদালত প্রতিষ্ঠা: সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ব্যপ্তি ও আয়তন, বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ও আদালতের ভৌগোলিক দূরত্ব বিবেচনায় নিয়ে সংরক্ষিত বনাঞ্চল সম্বলিত জেলা চট্টগ্রাম, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, কক্সবাজার, মৌলভীবাজার, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহে ৭টি বন আদালত সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়।

মেরিন আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি: বর্তমানে ঢাকায় একটি মেরিন আদালত রয়েছে। চট্টগ্রাম ও খুলনায় সমুদ্র বন্দর থাকলেও সেখানে মেরিন আদালত না থাকায় মেরিন সংক্রান্ত অপরাধ বিচারের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে ঢাকায় আসতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় দূরত্ব বিবেচনায় নিয়ে উক্ত দুটি সমুদ্র বন্দর এলাকায় পৃথক দুটি মেরিন আদালত প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

১.৬.৩ বিশেষায়িত বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশে বাণিজ্যের প্রসারকে বেগবান করা, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি নিশ্চিত করার স্বার্থে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্পই নেই। সংস্কার কমিশনের সাথে মতবিনিময়কালে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অফ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)-এর প্রতিনিধিসহ অন্যান্য অংশীজন দ্রুততার সাথে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের উপর জোর দেন।

এই প্রেক্ষাপটে কমিশন নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব করছে:

(ক) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের নিরিখে সুনির্দিষ্ট কিছু জেলা আদালতে প্রয়োজন অনুসারে এক বা একাধিক বাণিজ্যিক আদালত স্থাপন করা যেতে পারে।

(খ) এই লক্ষে যথাযথ বিধান সম্বলিত একটি আইন প্রণয়ন করতে হবে, এবং দেওয়ানি কার্যাবিধিসহ অন্যান্য আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

(গ) Civil Courts Act 1887-এ নির্ধারিত যুগ্ম জেলাজজের আর্থিক এখতিয়ারের (২৫ লাখ টাকার বেশি) আলোকে যুগ্ম জেলাজজ পর্যায়ের বিচারকদের সমন্বয়ে বাণিজ্যিক আদালত গঠন করা যেতে পারে, এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়বস্তুগুলো বাণিজ্যিক আদালতের এখতিয়ারভুক্ত করা যেতে পারে, যথা:

(অ) ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন, চুক্তি ও বাণিজ্যিক দলিলাদি (commercial instruments) থেকে উদ্ভূত অধিকার ও দায়-দায়িত্ব;

(আ) পণ্য বা সেবার আমদানি-রফতানি বা ক্রয়-বিক্রয়;

(ই) নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি;

(ঈ) বীমা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(উ) মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত বিষয়াদি

(ঊ) এজেন্সি ও ফ্র্যাঞ্চাইজি সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(ঋ) সরবরাহ/বিতরণ ও লাইসেন্সিং সংক্রান্ত চুক্তি;

(এ) অংশীদারি চুক্তি;

(ঐ) প্রযুক্তি উন্নয়ন (technology development) চুক্তি;

(ও) যৌথ উদ্যোগ (joint venture) বা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে চুক্তি; এবং অন্যান্য বিষয়াদি, যা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বাণিজ্যিক আদালতের এখতিয়ারাধীন বলে নির্ধারণ করবে।

(ঘ) সালিস আইন সংশোধন করে সালিস সংক্রান্ত বিষয়াদি (আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিস ব্যতীত) বাণিজ্যিক আদালতের উপর ন্যস্ত করা বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) Civil Courts Act 1887 সংশোধন করে বাণিজ্যিক আদালতের ডিক্রির বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে সরাসরি আপিল দায়ের করার বিধান করতে হবে।

(চ) অর্থঋণ আদালত আইনের অনুসরণে বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত আইনে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল ও রিভিশনের বিধান রাখা যাবেনা।

(ছ) বাণিজ্যিক আদালতে বিচারাধীন বিরোধগুলোকে মধ্যস্থতা (mediation) বা অন্য কোন বিকল্প পদ্ধতিতে নিরসণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে আইনে প্রয়োজনীয় কার্যকর বিধান করতে হবে।

(জ) বাণিজ্যিক আদালত থেকে উদ্ভূত বিষয়াদির নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্ট বিভাগেও এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন বেঞ্চ গঠন করতে হবে। হাই কোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ বিভাগীয় সদরগুলোতে স্থাপিত[২৪] হওয়ার পর বিভাগীয় পর্যায়ে এ ধরনের বেঞ্চ গঠন করা যেতে পারে, যেন স্থানীয় পর্যায়ে বাণিজ্যিক বিরোধগুলোর সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভবপর হয়।

(ঝ) বাণিজ্যিক বিরোধের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিচারকদের হালনাগাদ তথ্য নিয়মিতভাবে অবহিতকরণ এবং যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.৬.৪ আদালতের সাংগঠনিক কাঠামোতে আইটি শাখা অন্তর্ভুক্তকরণ

দেশের জেলা জজ আদালত, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং মহানগর দায়রা জজ আদালতের অধীনে বিভিন্ন স্তরের বহু সংখ্যক আদালত কাজ করলেও এসব প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোতে কোন আইটি কর্মকর্তা কিংবা আইটি শাখা নেই। এর ফলে এসব প্রতিষ্ঠান এবং অধীনস্থ আদালতে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, নেটওয়ার্কিং, প্রোগ্রামিং ইত্যাদি যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। আদালতের ব্যবহার্য কম্পিউটারসহ কোন আইসিটি যন্ত্রাংশে কোনোরকম ত্রুটি বা অসুবিধা দেখা দিলে আদালতের পুরো কার্যক্রমে এর প্রভাব পড়ে। দেশের সকল জেলা জজ আদালত, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং মহানগর দায়রা জজ আদালতের সাংগঠনিক কাঠামোতে আইটি অফিসারসহ একটি আইটি শাখা অন্তর্ভুক্ত করা গেলে বিচার কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করা সহজতর

[২৪] ষষ্ঠ অধ্যায় দেখুন।

হবে। উক্ত আইটি শাখায় ১ জন সহকারি প্রোগ্রামার, ১ জন সহকারি মেইনটেইনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, ১ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং ১ জন অফিস সহায়ক পদ সৃষ্টি করতে হবে।

১.৬.৫ সহকারি জজ ও সিনিয়র সহকারি জজ এর বিদ্যমান পদ নাম পরিবর্তন

Civil Courts Act, 1887 এর ধারা ৩ এ বিভিন্ন রকম দেওয়ানি আদালত সম্পর্কে বলা হয়েছে । উক্ত ধারায় অন্যান্য দেওয়ানি আদালতের পাশাপাশি সিনিয়র সহকারি জজ আদালত এবং সহকারি জজ আদালতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। একজন বিচারকের পদবীর শুরুতে 'সহকারি' শব্দটি থাকায় এটি অনেক সময় জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সহকারি/সহকারি জজগণকেও এ কারণে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। এমতাবস্থায় বিচারকের পদমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে 'সহকারি জজ' এর পরিবর্তে 'সিভিল জজ' এবং 'সিনিয়র সহকারি জজ' এর পরিবর্তে 'সিনিয়র সিভিল জজ' নামকরণ করা সমীচীন। এ ক্ষেত্রে Civil Courts Act, 1887 এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে।

১.৬.৬ আদালতে অপর্যাপ্ত পরিচ্ছন্নতা কর্মী

দেশের অধিকাংশ আদালতে যে সংখ্যক পরিচ্ছন্নতা কর্মী রয়েছে চাহিদার তুলনায় এটি খুবই অপর্যাপ্ত। বহুতল বিশিষ্ট একেকটি আদালত ভবনের জন্য কোথাও একজন কিংবা কোথাও দুইজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী রয়েছে। এত স্বল্প সংখ্যক পরিচ্ছন্নতা কর্মী দিয়ে সকল আদালতের এজলাস, করিডোর, খাসকামরা, ওয়াশরুম, আদালত প্রাঙ্গণ ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন করা সম্ভব নয়। আদালত প্রাঙ্গণের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার্থে প্রত্যেক ফ্লোরের জন্য একজন অথবা আদালতের প্রত্যেকটি স্থাপনার (জেলা জজ আদালত, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত) বিপরীতে ন্যূনতম পাঁচ জন করে পরিচ্ছন্নতা কর্মী জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ করা প্রয়োজন।

১.৬.৭ আদালতের জনবল কাঠামো হতে আউটসোর্সিংভুক্ত পদ বাদ দিয়ে স্থায়ী পদ সৃষ্টি

বর্তমানে বিভিন্ন আদালতের জনবল কাঠামোতে বেশ কিছু পদকে আউটসোর্সিংভুক্ত করা হয়েছে। এসব পদের মধ্যে জারিকারক, অফিস সহায়ক এবং গাড়ি চালক উল্লেখযোগ্য। আদালত যেহেতু একটি আইনি প্রতিকার প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, সেহেতু এর জনবল কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে আদালতের গোপনীয়তা, সুরক্ষা, স্পর্শকাতরতা ইত্যাদি বিবেচনায় নিতে হবে। আদালতকে নিরাপত্তা ঝুঁকি থেকে রক্ষার জন্য চুক্তিভিত্তিক কিংবা আউটসোসিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ করা সমীচীন নয়। এ কারণে অধস্তন আদালতের জনবল কাঠামোতে থাকা আউটসোর্সিংভুক্ত পদগুলোকে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

১.৭ আদালতের সহায়ক কর্মচারি সংক্রান্ত বিষয়াবলি

১.৭.১ কর্মচারিগণের নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে সমস্যা ও সুপারিশ

অধস্তন আদালতে কর্মচারি নিয়োগের জন্য বর্তমানে ২টি নিয়োগ বিধি রয়েছে। জেলা জজ ও অধস্তন আদালতসমূহ এবং বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতসমূহ (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮৯ এবং জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি ও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসির আদালতসমূহ (সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৮ এর আওতায় অধস্তন আদালতের কর্মচারি নিয়োগ প্রদান করা হয়। উভয় নিয়োগ বিধি অনুসারে সংশ্লিষ্ট জজশিপ বা ম্যাজিস্ট্রেসির বিচারকদের সমন্বয়ে গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটি আদালতের কর্মচারি নিয়োগের লক্ষ্যে যাচাই-বাছাইপূর্বক উপযুক্ত ব্যক্তিদের নাম সুপারিশ করে।

জেলা পর্যায়ের আদালতে কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। কমিশন বিচারকসহ বিচার বিভাগের অন্যান্য অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় করে জানতে পেরেছে যে, স্বচ্ছভাবে আদালতের কর্মচারি নিয়োগ করা বিচার বিভাগের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদালতের কর্মচারি নিয়োগের এই পদ্ধতিটি একদিকে বিচারিক কাজের বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, অন্যদিকে বিচার বিভাগের ভাবমূর্তিকেও ক্ষুন্ন করছে। কর্মচারি নিয়োগের বিদ্যমান প্রক্রিয়া থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তথা জজশিপ ও

ম্যাজিস্ট্রেসির বিচারকগণকে বাইরে রাখা উচিত। কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে স্থানীয়ভাবে গঠিত বাছাই কমিটির পরিবর্তে কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মচারি নিয়োগ করা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে।
****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:** এক্ষেত্রে কমিশন নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করছে:

১. অধস্তন আদালতে কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ও দায়রা জজ বা ক্ষেত্রমত মহানগর দায়রা জজ, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে নিয়োগযোগ্য আদালতভিত্তিক তৃতীয় (করণিক) ও তদূর্ধ্ব শ্রেণির শূন্য পদের একটি তালিকা জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনে প্রেরণ করবে;

২. জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সারাদেশ থেকে প্রাপ্ত সকল শূন্য পদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক নিয়োগের জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের দরখাস্ত আহবান করে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। কমিশন প্রাপ্ত দরখাস্ত যাচাই-বাছাই করে উপযুক্ত প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত করে নিয়োগ বিধি মোতাবেক পরীক্ষা গ্রহণ করবে;

৩. জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন রিকুইজিশন মোতাবেক দেশের ৮টি বিভাগে পরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং ফলাফল প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণ করবে। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে জেলাজজ বা মেট্রোপলিটন সেশন জজ বা বিশেষায়িত আদালতের বিচারক কর্মচারিগণের নিয়োগ প্রদান করবে। এক্ষেত্রে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারিদেরকে তাদের নিজ নিজ জেলায় পদায়নের প্রয়াস থাকা বাঞ্ছনীয়।

১.৭.২ আদালতের কর্মচারিদের পদোন্নতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য

অধস্তন আদালতে সহায়ক কর্মচারি জন্য বর্তমানে ৩৪ ধরনের পদ রয়েছে। উক্ত পদগুলোর ধরন, বেতন স্কেল, নিয়োগের যোগ্যতা ও পদমর্যাদা বা গ্রেড পর্যালোচনায় দেখা যায় অধিকাংশ পদই তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণির পদ। আদালতে দ্বিতীয় শ্রেণির মাত্র একটি পদ (প্রশাসনিক কর্মকর্তা) রয়েছে। আদালতের বিদ্যমান জনবল কাঠামোতে প্রথম শ্রেণির কোনো পদই নেই। প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির পদ না থাকার কারণে আদালতের কর্মচারিদের মধ্যে পেশাদারিত্ব কম। তাদের কাজের মান এবং দক্ষতাও সন্তোষজনক নয়। এছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদ না থাকায় অন্যান্য কর্মচারিদের পদোন্নতির সুযোগ খুবই সীমিত। অথচ একই ধরনের বা সমপর্যায়ের পদে অন্যান্য অফিস বা দপ্তরে পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। আদালতের বিদ্যমান প্রশাসনিক কাজের বিস্তৃতি বিবেচনায় নিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তর আরো বাড়ানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সহকারি প্রশাসনিক কর্মকর্তা- এই দুইটি পদ সৃজন করা যেতে পারে। জেলা জজ ও বিশেষ জজ আদালতের জন্য একটি এবং ম্যাজিস্ট্রেসির জন্য অন্যটি উভয় বিধিমালায় সংশোধনক্রমে একই রূপ মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে।

সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:

১. কর্মচারিদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিদ্যমান ২টি চাকুরি বিধি সংশোধন করে একই ধরনের যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে।

২. প্রশাসনিক কর্মকর্তার দপ্তর সম্প্রসারিত করে উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সহকারি প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদ সৃজন করতে হবে।

৩. দেশের ৬৪টি জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ৬৪টি চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ৮টি চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং ৮টি মহানগর দায়রা জজ আদালতসহ স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আদালত ও ট্রাইব্যুনালে এ অধ্যায়ের ১.৭.১ নং ক্রমিকভুক্ত ছকের ৬ নং কলামে উল্লিখিত ২,৬৪৪টি বিচারকের পদ জরুরি ভিত্তিতে সৃষ্টি করতে হবে।

৪. এ অধ্যায়ের ১.৭.২ নং ক্রমিকের (ক) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বরিশালে, রংপুর ও গাজীপুরে মহানগর দায়রা আদালত, (খ) নং ক্রমিকের (১) এ বর্ণিত পৃথক মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, (২) এ বর্ণিত পৃথক পারিবারিক আদালত ও পারিবারিক আপীল আদালত, (৩) এ বর্ণিত পৃথক অর্থঋণ আদালত, (৪) এ বর্ণিত স্বতন্ত্র শিশু আদালত, (৫) এ বর্ণিত পরিবেশ আদালত, (৭) এ বর্ণিত

পৃথক দ্রুত বিচার আদালত, (৮) এ বর্ণিত পৃথক বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত, (৯) এ বর্ণিত পৃথক বন আদালত এবং (১০) এ বর্ণিত মেরিন আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫. পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ সংশোধনপূর্বক পার্বত্য জেলাগুলোতে পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬. ১.৭.৩.৬ ক্রমিকের প্রস্তাব মতে দেওয়ানি কার্যবিধি আইন সংশোধনপূর্বক পৃথক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭. সকল জেলা জজ আদালত, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং মহানগর দায়রা জজ আদালতের সাংগঠনিক কাঠামোর TO&E-তে আইটি শাখা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আইটি শাখায় ১ জন সহকারি প্রোগ্রামার, ১ জন সহকারি মেইনটেইনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, ১ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং ১ জন অফিস সহায়কের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

৮. Civil Courts Act, 1887 এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ সংশোধনপূর্বক সহকারি জজ/সিনিয়র সহকারি জজের পদনাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে সিভিল জজ এবং সিনিয়র সিভিল জজ নামকরণ করতে হবে।

৯. আদালতের প্রত্যেকটি স্থাপনার (জেলা জজ আদালত, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত) বিপরীতে পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্নতা কর্মীর পদ সৃষ্টি করতে হবে।

১০. আদালতের সহায়ক কর্মচারিদের নিয়োগ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ব্যবস্থাপনায় বিভাগীয় পর্যায়ে গৃহীত পরীক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

১১. সহায়ক কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়াতে এবং তাদের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনবল কাঠামোতে প্রথম শ্রেণির পদ সৃজন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির পদসংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান আদালত এবং প্রস্তাবিত অতিরিক্ত অদালত এর জন্য সুপারিশকৃত জনবলের সংগঠনিক কাঠামো মূল প্রতিবেদনের একাদশ অধ্যায়ের ১.৩.১ অনুচ্ছেদে 'আদালতের জনবল ও সাংগঠিনক কাঠামো' শিরোনামে একটি ছকে বিস্তারিতভাবে বলা আছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদে Judicial Administrative Officer (JAO) এর পদ সৃষ্টি বিষয়ে নিম্নরূপ সুপারিশ করা হয়েছে–

*যে সকল জেলায় মামলা জটের পরিমাণ বেশি সে সকল জেলায় সাক্ষী ব্যবস্থাপনাসহ আদালত ব্যবস্থাপনার অন্যান্য প্রশাসনিক দিক তদারকির নিমিত্তে সহকারী বা সিনিয়র সহকারী জজ পদমর্যাদার Judicial Administrative Officer (JAO) এর পদ সৃষ্টি করতে হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়: বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা

১.১ ভূমিকা: বিচার বিভাগের স্বাধীনতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক স্বাধীনতা এবং বিচারকদের কর্মকালের নিরাপত্তা। বিচার বিভাগের কার্যকরতা নিশ্চিত করার জন্যও আর্থিক স্বাধীনতা প্রয়োজন, অন্যথায় বিচারিক সেবার মান হ্রাস পায়। বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে বিচার বিভাগকে বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বাধীন করতে হবে এবং বিচার বিভাগের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদনের স্বার্থে বিচারকদের আর্থিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে হবে।

১.২ মাসদার হোসেন মামলার রায়ে বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা প্রসঙ্গ: মাসদার হোসেন মামলার রায়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সুপ্রীম কোর্টের জন্য বার্ষিক যে বাজেট বরাদ্দ করা হবে তার সীমার মধ্যে প্রধান বিচারপতি নির্বাহী বিভাগ, যেমন অর্থ মন্ত্রণালয়ের, হস্তক্ষেপ ছাড়াই ব্যয় করার অনুমতি প্রদান করতে পারবেন।

২.১ বিচার বিভাগের বাজেট নির্ধারণ ও ব্যয়: বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৮ এবং ৮৯(১) অনুচ্ছেদ বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আংশিক পদক্ষেপ। এ পরিস্থিতিতে বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য কমিশনের প্রস্তাব নিম্নরূপ:

(১) সংবিধানের ৮৮(চ) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রস্তাবিত সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় আইনে এই মর্মে একটি বিধান যোগ করতে হবে যে, সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালতের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট হবে একটি দায়যুক্ত ব্যয়। এই বাজেট নির্ধারণের ক্ষমতা থাকবে প্রধান বিচারপতির উদ্যোগে গঠিত বাজেট প্রণয়ন কমিটির উপর।

(২) সুপ্রীম কোর্টের জন্য বরাদ্দকৃত যে বাজেট সংসদে পাশ হবে তা স্বাধীনভাবে খরচ করার স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। বাজেট উপযোজন এবং পুনঃউপযোজনের পরিপূর্ণ ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টকে প্রদান করতে হবে।

(৩) সুপ্রীম কোর্টকে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।

২.২ বিচারপতিদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের আর্থিক বিষয়াদি নির্ধারিত রয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের পারিতোষিক, বিশেষাধিকার ও অন্যান্য ভাতা বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্য বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির নির্দেশ অনুসারে একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। নির্বাহী বিভাগ যাতে উক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে সংসদের নিকট উপস্থাপন করে তেমন বিধান রাখতে হবে।

৩.১ বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি: বিচার বিভাগের জন্য উন্নয়নখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। উন্নয়নখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

৩.২ বাজেটের খাতের পরিবর্তন: বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ করা হয় জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা খাতে। রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান অঙ্গের একটি হওয়ায় বিচার বিভাগের জন্য পৃথক খাতভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান করা প্রয়োজন। বাজেটে 'বিচার' নামে পৃথক একটি খাত সৃজন করে বিচার বিভাগের জন্য বাজেট উক্ত খাতে বরাদ্দ করা প্রয়োজন। সংসদে বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি উপস্থাপনের সময় অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী খাতভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেন। বিচার নামে পৃথক খাত সৃষ্টি করলে বিচার বিভাগের বাজেট বরাদ্দের বিষয়টি আলাদাভাবে গুরুত্ব পাবে।

৩.৩ বাজেট প্রাক্কলনে বিচার বিভাগের প্রতিনিধি

(১) বিচার বিভাগের বাজেট বরাদ্দ জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে ১ (এক) শতাংশে অবিলম্বে উন্নীত করতে হবে এবং প্রয়োজনে ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি করতে হবে।

(২) বাজেটে 'বিচার' নামে পৃথক খাত সৃষ্টি করতে হবে।

(৩) বাজেট মনিটরিং ও রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে বিচার বিভাগের প্রতিনিধি যুক্ত করতে হবে।

৪.১ জুডিসিয়াল সার্ভিস পে-কমিশনের স্থায়ী কাঠামো কার্যকর করা: বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (পে-কমিশন) বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধিগুলো পর্যালোচনা করলে এটি স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস পে-কমিশন একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান এবং নিয়মিতভাবে এ কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান রয়েছে। বর্তমানে জুডিসিয়াল সার্ভিস পে কমিশনের চেয়ারম্যান পদে কেউ নিযুক্ত নেই। ফলে উক্ত কমিশন পূর্ণাঙ্গভাবে গঠিত নেই।

(১) জুডিসিয়াল সার্ভিস পে কমিশনের স্থায়ী কাঠামোকে কার্যকর করতে হবে।

(২) প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সার্ভিসের বেতন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সার্ভিসের সদস্যদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন এবং তা সরকারের নিকট পেশ করার বিধান কার্যকর করতে হবে।

৪.১ বিচারকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

৪.১.১ বেতন কাঠামো

মাসদার হোসেন মামলায় আপীল বিভাগ প্রদত্ত ১২ দফা নির্দেশনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হচ্ছে বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যদের জন্য স্বতন্ত্র পে-কমিশন গঠন এবং তাদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো নির্ধারণ। এই নির্দেশনার ভিত্তি হচ্ছে সংবিধান অনুসারে বিচার-কর্মবিভাগের সদস্যগণ সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত ও ঘোষিত একটি সার্ভিসের সদস্য বিধায় তারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে তুলনীয় নন। পরবর্তীতে এই রায়ের প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশ বনাম মো: আতাউর রহমান ও অন্যান্য মামলায়[২৫] আপীল বিভাগ প্রদত্ত সিদ্ধান্তে, যেখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে জেলাজজ ও সমপদমর্যাদার বিচারকদের সরকারের সচিবের সমমর্যাদা (ওয়ারেন্ট অব পিসিডেন্স এর ১৬ নম্বর ক্রমিকে) এবং অতিরিক্ত জেলাজজদের সরকারের সচিবের সমমর্যাদার অন্যান্য কর্মকর্তাদের (ওয়ারেন্ট অব পিসিডেন্স এর ১৭ নম্বর ক্রমিকে) অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে। উক্ত দুটি রায়ের আলোকে জেলা জজ এবং সমপর্যায়ের বিচারকদের বেতন সচিবের সমান হওয়া প্রয়োজন। একই কারণে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জেলা জজগণ (সিনিয়র জেলা জজ) এর বেতন সরকারের সিনিয়র সচিবের সমান হওয়া উচিত।

সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:

(১) সিনিয়র জেলা জজদের বেতন সিনিয়র সচিবের সমান করতে হবে। জেলা জজদের বেতন-স্কেল জাতীয় গ্রেডের ১ নম্বর গ্রেডে সচিবদের সমান করতে হবে।

(২) অন্যান্য ধাপের বিচারকদের বেতন-স্কেল জাতীয় গ্রেডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

(৩) জুডিসিয়াল ভাতা বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬ এর বেতন-স্কেলের ৫০ শতাংশ করতে হবে।

(৪) জেলা জজগণকে কুক ও সিকিউরিটি এলাউন্স প্রদান করতে হবে।

(৫) অতিরিক্ত জেলা জজগণকে ডোমেস্টিক এইড এলাউন্স প্রদান করতে হবে।

(৬) জেলা জজগণের প্রাপ্য অন্যান্য সুবিধাদি সরকারের সচিব পদে কর্মরত কর্মকর্তার সমান নির্ধারণ করতে হবে।

[২৫] ৬৯ ডিএলআর (এডি) (২০১৭) ১৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়: বিচার কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

১. ভূমিকা

তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা বেশ পিছিয়ে রয়েছে। প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর অভাব, মানবসম্পদের দক্ষতার ঘাটতি এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতা এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বে সফলভাবে পরীক্ষিত প্রযুক্তি বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থাতে ক্রম-অঙ্গীভূতকরণ (Integration)-এর জন্য বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. সুপারিশকৃত পদক্ষেপসমূহ এবং সেগুলি বাস্তবায়নের রূপরেখা (২.১-২.৩)

২.১ আইনি সংস্কার

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিচার বিভাগ রূপান্তরে ডাটাবেজ প্রস্তুত, সংরক্ষণ, নিরাপত্তা, ডিজিটাল রেকর্ড, ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর, ভার্চুয়াল তদন্ত, সাক্ষ্য গ্রহণ, শুনানি গ্রহণ, রায় প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬, আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ প্রণীত হয়েছে। এছাড়া ব্যাংক ও মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে কোর্ট ফি গ্রহণের জন্য The Court-Fees Act, 1870 এবং ডিজিটাল/ইলেক্ট্রনিক সাক্ষ্যকে মূল্যায়নের জন্য The Evidence Act, 1872 সংশোধিত হয়েছে। বিদ্যমান আইনি কাঠামোর সাথে ই-জুডিসিয়ারি, ই-সমন/পরোয়ানা ব্যবস্থাপনা, স্থায়ী ডাটাবেজ প্রস্তুত, ই-কেইস ম্যানেজমেন্ট, ই-অফিস ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগে জন্য বিশেষভাবে নিম্নবর্ণিত আইনগুলির সংশোধন প্রয়োজন:

১. The Code of Civil Procedure, 1908:
২. The Code of Criminal Procedure, 1898:
৩. The Civil Rules and Orders:
৪. The Criminal Rules and Orders (Practice and Procedure of Subordinate Courts), 2009:

২.২ বিচার ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় রোডম্যাপ

আধুনিক বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় উপরে আলোচিত তথ্য-প্রযুক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, ক্রমান্বয়ে অভিযোজন (Gradual Adaption), পরীক্ষামূলকভাবে উপনীত সমাধান (Trial & Error) ভিত্তিতে পরিকল্পনার ফলপ্রসূ বাস্তবায়ের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদে তিন পর্যায়ে বাস্তবায়নের রূপরেখা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

প্রথম পর্যায়: (Development Phase)

বাস্তবায়ন কাল: ১-৫ বছর

বিচার ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য বিচার সংশ্লিষ্ট পক্ষদের তথ্য প্রযুক্তির সেবার সাথে পরিচিতি ঘটনো এবং স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহারে আগ্রহী করাই প্রথম পর্যায়ের প্রধান চ্যালেঞ্জ। আদালতে স্থায়ী সফটওয়ার ও হার্ডওয়ার সংক্রান্ত অবকাঠামো প্রস্তুত, আইন ও বিধি সংশোধন, জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধান এবং অভিজ্ঞতার মূল্যায়নের মাধ্যমে নিম্নরূপে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা যাবে।

কমিটি, অফিস ও পদ

বিচার বিভাগের ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে সুযোগ্য নেতৃত্ব, সঠিক পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় গবেষণা, নিয়মিত তদারকি এবং সফল বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কমিটি, অফিস এবং পদ সৃজনের সুপারিশ করা হল:

- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে প্রধান করে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রানালয়ের মন্ত্রীগণের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী জাতীয় পরামর্শক কমিটি/কেন্দ্রীয় ই-কমিটি (National Advisory Committee/Central E-Committee) গঠন করতে হবে। এই উচ্চ পর্যায়ের কমিটি বিচার বিভাগের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এবং সার্বিক তদারকি করবে।
- সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে প্রধান করে একটি ই-জুডিসিয়ারি পলিসি/ ফ্রেমওয়ার্ক কমিটি (E-judiciary Policy/Framework Committee) গঠন করতে হবে। এই কমিটি বিচার বিভাগের সামগ্রিক ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম সংক্রান্ত কারিগরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তদারকি এবং বাস্তবায়ন করবে।
- বিচার বিভাগ ডিজিটালাইজেশনকে তত্ত্বাবধানের জন্য একজন রেজিস্ট্রার (আইসিটি), দুই জন অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ও চার জন সহকারি রেজিস্ট্রার সহ প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবল নিয়ে সুপ্রীম কোর্টে আইসিটি বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে। কারিগরি জনবলের ক্ষেত্রে ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের জন্য প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো অনুসরণ করা যেতে পারে।
- জজ-ইন-চার্জ (আইসিটি) পদ সৃজন করে দেশের সকল জেলায় জেলা জজ আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত ও চিফ জুডিসিয়াল/ চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রযুক্তি জ্ঞানে দক্ষ একজন বিচারককে উক্ত পদের দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। তার অধীনে ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পে জেলা আদালতের জন্য প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো অনুসরণ পূর্বক রাজস্ব খাতে সমসংখ্যক পদ সৃজন করা যেতে পারে।
- বিচার বিভাগে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অটুট রাখার জন্য ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প চলমান থাকা অবস্থায় প্রত্যকেটি জেলা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে রাজস্ব খাতে নিয়মিত দক্ষ জনবল কাঠামো প্রস্তুত ও নিয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে ই-জুডিসিয়ারী প্রকল্পে প্রস্তাবিত জনবল কাঠামোর সমসংখ্যক পদ সৃজনের পাশাপাশি প্রত্যেক আদালতের জন্য আবশ্যিকভাবে 'ডাটা এন্ট্রি অপারেটর' পদ সৃজন করতে হবে।
- সকল জেলার জেলা জজ, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও স্থানীয় আইনজীবী সমিতির সভাপতির সমন্বয়ে জেলা ই-কমিটি (District e-committee) গঠন করতে হবে। জাজ-ইন-চার্জ (আইসিটি) এই কমিটির সদস্য সচিব হবেন। কমিটি ডিজিটালাইজেশন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ই-জুডিসিয়ারি পলিসি/ফ্রেমওয়ার্ক কমিটি বরাবরে প্রেরণ করবেন।
- সকল নাগরিকের জন্য বিচার বিভাগের ডিজিটাল সেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতের জন্য সকল জেলায় জেলা জজ আদালত ও চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ই-ডেস্ক/ ই-কর্নার স্থাপন করতে হবে। পর্যায়ক্রমে সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ অফিসে লোকাল গভর্নমেন্ট জুডিসিয়াল ই-ডেস্ক / ই-কর্নার স্থাপন করা যেতে পারে।
- সকল আইনজীবী সমিতির অফিসে ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্পের মাধ্যমে ই-ক্যাফে স্থাপন করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়: (Adaptation Phase)

বাস্তবায়ন কাল: ৬-১০ বছর

ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির উপযোগিতা মূল্যায়ন, বিচারক, আদালতের সহায়ক কর্মচারি ও আইনজীবীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে বিচারপ্রার্থী জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সেবা গ্রহীতার অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়নপূর্বক দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য নিম্নরূপে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

- ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প শেষে চলমান সেবার সাথে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি তথা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ব্লক চেইন প্রযুক্তি, ভার্চুয়াল রিয়ালেটি, অগমেন্টেড রিয়ালিটি এবং IoT (Internet of Things) প্রযুক্তির ব্যবহার উপযোগিতা বিবেচনায় ই-জুডিসিয়ারি (২য় পর্ব) প্রকল্প শুরু করতে হবে।
- প্রত্যেক আদালতে বিচারকালে ভয়েস টু টেক্সট ও কোর্ট রিপোর্টিং সফটওয়্যার চালু করতে হবে।

- ভূমি জরিপ অধিদফতরের সাথে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS), পুলিশ প্রশাসনের সিডিএমএস, রেজিস্ট্রেশন অধিদফতরের ই-রেজিস্ট্রেশন (ল্যান্ড ও নিকাহ রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত) সফটওয়্যারসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য বিভাগের বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও ডিজিটাল সেবার সাথে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গভাবে প্রবর্তন করতে হবে।
- আসামীদের প্রবেশনের জন্য ই-প্রফাইলিং সফটওয়্যার চালু করতে হবে।
- আদালতের বিভিন্ন বিচারকের মধ্যে মামলা বণ্টন করার জন্য কেস ডিস্ট্রিবিউশন মডিউল প্রস্তুত করতে হবে যার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদালতগুলোতে মামলা বণ্টন করা যাবে।
- কোর্টরুম রিপোর্টিং মডিউল প্রস্তুত করা যেতে পারে যার মাধ্যমে আদালতের সমস্ত কার্যক্রমের অডিও-ভিজুয়াল রেকর্ডিং তথা বিচার কার্যক্রম, সাক্ষী গ্রহণ এবং অন্যান্য মামলার আলোচনাসহ সমস্ত কার্যক্রম রেকর্ড করা হবে।
- JATI ও জুডিসিয়াল একাডেমির তত্ত্বাবধানে একটি সেলফ লার্নিং মডিউল সৃজন করতে হবে।
- বিচার ব্যবস্থায় নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণা চালাতে হবে এবং প্রস্তাবিত সকল সেবার উপকারভোগীর অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয় পর্যায় (Scaling up Phase):

বাস্তবায়ন কাল: ১১-১৫ বছর

সফলভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাপ্তি বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে তথ্য প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করবে এবং বিচার ব্যবস্থায় জনগণের প্রবেশাধিকার ও আস্থা বৃদ্ধি পাবে। জনগণ আধুনিক প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত হবে এবং ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবার পরিধি বৃদ্ধি এবং এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য তৃতীয় পর্যায়ে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- পূর্ববর্তী পর্যায়দ্বয়ে চালুকৃত ডিজিটাল সিস্টেমগুলোকে এই পর্যায়ে সময়উপযোগীকরণ (Update), বর্ধিতকরণ (Enhancement) এবং শতভাগ কার্যকর করাই হবে এই পর্যায়ের মূল লক্ষ্য।
- দেওয়ানি আদালতে ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনায় ১০০% মামলা দায়েরের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে।
- সকল আদালতে বর্তমান ব্যবস্থার পাশাপাশি ই-পেমেন্টের মাধ্যমে ই-ফাইলিং সহ সকল কোর্ট-ফি, খরচ, জরিমানা ও অন্যান্য ফি পরিশোধের ক্ষেত্রে ১০০% লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে।
- ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে ইতোপূর্বে ব্যবহৃত সেবার পরিধি ও মান বৃদ্ধি করতে হবে।

২.৩ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা

অধস্তন আদালতসহ বিচার বিভাগের বিচারিক কাজের তদারকির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিধায় বিচার বিভাগের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত নেতৃত্বও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের নিকট থাকতে হবে।

চর্তুদশ অধ্যায়: অধস্তন আদালতের ভৌত অবকাঠামো

১. ভূমিকা

কার্যকরভাবে বিচারিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আদালতের সামগ্রিক পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো উন্নত মানের ভৌত অবকাঠামো নিশ্চিত করা। তবে বাস্তবতা হলো, পর্যাপ্ত এজলাস না থাকার কারণে এখনও বিচারকদের এজলাস ভাগাভাগি করে বিচারকাজ সম্পাদন করতে হচ্ছে। ফলে বিচারিক কর্মঘণ্টার সুষ্ঠু ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে করে বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে এবং বিচার বিভাগের কার্যকরতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

২. আদালতের ভৌত অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা

২.১ জেলা জজ আদালত: আইন ও বিচার বিভাগের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ৬৪টি জেলা জজ আদালত ভবনের ২৯টি নির্মিত হয়েছে ১৯৯০ এর দশকে। ৯০'র দশকের পরে নির্মিত হয়েছে ১৩টি। এছাড়া ৮০'র দশকে নির্মিত হয়েছে ১০টি এবং ৮০'র দশকের পূর্বে নির্মিত হয়েছে ৯টি। পূর্বের নির্মিত ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে ৩টি ভবনের। এ অবস্থায় ৬৪টি জেলা জজ আদালত ভবনের অধিকাংশেরই অবস্থা জরাজীর্ণ, নাজুক ও ভঙ্গপ্রায়। বেশিরভাগ ভবনের অবস্থা এতই নাজুক যে, এগুলো প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কিছু কিছু ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করার মতো অবস্থায় থাকলেও এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেই। আইন ও বিচার বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ৩৭টি জেলার[২৬] জেলা জজ আদালত ভবন প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। উক্ত ৩৭টি জেলার জেলা জজ আদালত ভবনের অবস্থা এতই ভগ্নপ্রায় ও জরাজীর্ণ যে, এগুলোতে সুষ্ঠুভাবে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করার মত অবস্থা নেই।

২.২ চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত: ম্যাজিস্ট্রেসি পৃথকীকরণের পর দেশের ৬৪টি জেলায় চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণের জন্য ২০০৯ সালে 'বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ প্রকল্প' গ্রহণ করা হলেও অদ্যাবধি এই প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি। ৪১টি জেলায় ভবন নির্মিত হয়েছে। ১৮টি জেলায় জমি অধিগ্রহণ করা হলেও দলিল রেজিস্ট্রেশন না হওয়া, একনেকে অনুমোদনের জন্য অপেক্ষাধীন থাকা, বাজেট বরাদ্দ না থাকা, জমির অবস্থান নিয়ে আইনজীবীদের আপত্তি থাকা ইত্যাদি নানা কারণে এখনও নির্মাণ কাজই শুরু হয়নি। এছাড়া ৫টি জেলায় এখনও পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রমই শুরু হয়নি।

২.৩ চৌকি আদালত: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে সারাদেশে ৬৭টি চৌকি আদালত রয়েছে। তন্মধ্যে ২৮টি ম্যাজিস্ট্রেট চৌকি আদালত এবং ৩৯টি দেওয়ানি চৌকি আদালত। ৬৭টি চৌকি আদালতের মধ্যে অন্তত ৫১টি আদালতের অবকাঠামো খুবই নাজুক, ভগ্নপ্রায় ও ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ২০টি জেলার অধীন ৩৪টি উপজেলাভুক্ত ৫১টি চৌকি আদালতের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং এগুলোতে সুষ্ঠুভাবে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করার মতো অবস্থা বিদ্যমান নেই। উক্ত ৫১টি চৌকি আদালতের জন্য পৃথক আদালত ভবন নির্মাণ করা অত্যাবশ্যক।

---

[২৬] বরগুনা, বাগেরহাট, বরিশাল, চুয়াডাঙ্গা, ঝালকাঠি, যশোর, পটুয়াখালী, খুলনা, চাঁদপুর, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, মাগুরা, কক্সবাজার, নড়াইল, খাগড়াছড়ি, বগুড়া, লক্ষ্মীপুর, নওগাঁ, নোয়াখালী, রাজশাহী, ফরিদপুর, কুড়িগ্রাম, গোপালগঞ্জ, পঞ্চগড়, মাদারীপুর, রংপুর, মুন্সীগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ, নরসিংদী, মৌলভীবাজার, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ, শরীয়তপুর, সিলেট ও টাঙ্গাইল।

৩. আদালতের অবকাঠামোজনিত অন্যান্য অসুবিধা

৩.১ এজলাস সংকট: বর্তমানে দেশের সকল আদালতের জন্য এজলাস নেই। ফলে বেশিরভাগ জেলায় একই এজলাস ও খাসকামরা একাধিক বিচারককে ভাগাভাগি করে বিচারকাজ পরিচালনা করতে হয়। এতে বিচারকদের কর্মঘণ্টা বিভাজিত হয়ে পড়ে। একই এজলাস দিনে দুইবার দুই আদালত কর্তৃক ব্যবহৃত হওয়ার কারণে বিচারপ্রার্থীকেও দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এজলাস সংকটের কারণে একটি আদালতের কার্যক্রম শেষ না হওয়া সত্ত্বেও অন্য আদালতের জন্য বিচারককে এজলাস ত্যাগ করতে হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি ও সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব মুলতবি রেখে এজলাস ত্যাগ করার কারণে বিচারপ্রার্থী জনগণকে বিচার ছাড়াই ফেরত যেতে হচ্ছে।

৩.২ আদালতের রেকর্ডরুম, নেজারত, নকলখানা, মালখানা, সেরেস্তা, জিআরও অফিস ইত্যাদি: আদালতের বিচারিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য স্থানসংকট প্রকট। আদালতের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখাকে কক্ষ ভাগাভাগি করে কাজ করতে হয়। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ঘাটতি রয়েছে। একইভাবে বিভিন্ন আদালতের নেজারত, রেকর্ডরুম, নকলখানা, কোর্ট হাজত ও মালখানার জন্য নির্ধারিত কক্ষ ও স্থান অপ্রতুল। অনেক ক্ষেত্রে ভবন অত্যধিক পুরনো হওয়ায় কক্ষগুলো স্যাঁতসেঁতে এবং সেগুলোতে পোকা-মাকড় বিশেষত উইপোকার উপদ্রব থাকে। ফলে আসবাবপত্রসহ মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। অনেক জেলার সেরেস্তা, নেজারত, নকলখানা, মালখানা, রেকর্ড রুমে বৃষ্টির পানি পড়ে নথিপত্র নষ্ট হয়। তাছাড়া, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মালখানার সুরক্ষার জন্য বেশির ভাগ জেলায় ভালো কোনো ব্যবস্থা নেই। কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় মালখানায় রক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ বহু আলামত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আদালত প্রাঙ্গণে পুলিশের অবস্থানের জন্য কোনো সুব্যবস্থা না থাকায় আদালতের দায়িত্ব পালনে তাদের অনীহা প্রকাশ পায়। বর্তমানে অনেক ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে জিআরও শাখার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভালো কোনো ব্যবস্থা নেই।

৩.৩ বিচারপ্রার্থী, সাক্ষী, নারী ও শিশুদের বসার স্থান ও শৌচাগারের অপ্রতুলতা: আদালতে বিচারপ্রার্থীদের বসার জন্য ভালো কোনো ব্যবস্থা নেই। আদালতের কার্যক্রম চলাকালে এজলাস কক্ষে আইনজীবীদের অত্যধিক ভিড় থাকায় আদালত কক্ষে তারা বসতে পারে না। অধিকাংশ বিচারপ্রার্থী ও সাক্ষীকে আদালত প্রাঙ্গণের বিভিন্ন স্থানে, আদালতের বারান্দায়, খোলা মাঠে, গাছতলায়, হোটেলে, দোকানে, আইনজীবীর চেম্বারে বসে বা দাঁড়িয়ে অপেক্ষার প্রহর গুণতে হয়। এছাড়া বেশিরভাগ আদালতে বিচারপ্রার্থীদের জন্য শৌচাগারের ন্যূনতম ব্যবস্থা নেই। কিছু আদালতে শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকলেও এগুলো অপরিস্কার, নোংরা ও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ৬৪টি জেলায় ন্যায়কুঞ্জ স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বিশ্রামাগারে বিচারপ্রার্থীদের বসার জন্য আসন, নারী-পুরুষ শৌচাগার, সুপেয় পানির ব্যবস্থা ও একটি করে দোকান নির্মাণের কথা রয়েছে। প্রকল্পটি কয়েকটি জেলায় বাস্তবায়িত হলেও আদালতে আগত জনগোষ্ঠীর তুলনায় এটি খুবই নগণ্য।

৩.৪ আইনজীবী এবং সরকারি আইন কর্মকর্তাদের অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা: দেশের আদালতগুলোতে আইনজীবীদের ব্যবহার্য অবকাঠামোর অপ্রতুলতা রয়েছে। আইনজীবীদের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু তাদের ব্যবহার্য স্থান বাড়ছে না। আইনজীবীদের সহকারি বা মুহুরিদের ক্ষেত্রেও একই চিত্র বিদ্যমান। একইভাবে অনেক এলাকায় সরকারি আইন কর্মকর্তাদের ব্যবহার্য স্থানেরও অপ্রতুলতা রয়েছে।

৩.৫ বিচারকদের আবাসন ঘাটতি: প্রায় সব জেলায় শুধুমাত্র জেলা জজদের জন্য নির্দিষ্টকৃত বাসভবন আছে। কিন্তু জেলা জজ পর্যায়ের অন্যান্য বিচারক এবং নিম্নতর পর্যায়ের বিচারকগণের জন্য বাসস্থান সুবিধা নেই বললেই চলে। চৌকি আদালতের অবস্থা আরো শোচনীয়। ব্যতিক্রম হিসেবে ঢাকা, রাজশাহী এবং খুলনা বিভাগীয় সদরে কিছু এ্যাপার্টমেন্ট আছে। অন্য কয়েকটি জেলায় বহু দিনের পুরাতন কয়েকটি বাসভবন আছে। এগুলোর প্রায় সবগুলোর অবস্থা জরাজীর্ণ।

৩.৬ ইনফরমেশন ডেস্ক: বিচারপ্রার্থীদের একটি বড় অংশ আদালতে এসে কারো নিকট তথ্য সহায়তা পায় না। অনেক সময় দেখা যায় মামলার সাক্ষী ও পক্ষগণ যে আদালতে হাজিরার জন্য এসেছে সে আদালত খুঁজে পায় না। আদালতের হাজতখানা না চেনার কারণেও অনেক মানুষ বিড়ম্বনায় পড়ে। অহেতুক হয়রানির শিকারও হয়। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হয় গ্রাম-গঞ্জ থেকে আসা সাধারণ নারী বিচারপ্রার্থীগণ। সঠিক তথ্য না পাওয়ায় এসব বিচারপ্রার্থী মানুষ বিভিন্ন প্রতারক ও দালাল গোষ্ঠীর খপ্পরে পড়ে অনেক ক্ষেত্রে সর্বস্বান্ত হয়।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:**

(১) ২.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ৩৭টি জেলার জন্য জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন নির্মাণের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্পের সুপারিশের ভিত্তিতে যেসব ক্ষেত্রে ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন ভবন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেত হবে।

(২) বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় যে ২৩টি জেলায় এখনো ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়নি সেগুলোর নির্মাণ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে। যে ৫টি জেলায় অদ্যাবধি জমি অধিগ্রহণ হয়নি সেগুলোর অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) ২০টি জেলার আওতাধীন ৩৪টি উপজেলায় অবস্থিত ৫১ টি চৌকি আদালতের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত প্রস্তাব অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে আদালত স্থাপনের প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সমন্বয় করে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

(৪) জেলা জজ আদালতের আওতাধীন ৬৬টি এবং চিফ জুডিসয়িাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের আওতাধীন ৬৪টি আদালতের জন্য জরুরি ভিত্তিতে এজলাস নির্মাণ করতে হবে।

(৫) মহানগর দায়রা জজ এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের জন্য পৃথক আদালত ভবন স্থাপন করতে হবে।

(৬) আদালতের নেজারত, সেরেস্তা, রেকর্ডরুম, নকলখানা, মালখানা, কোর্ট হাজত ও জিআরও শাখার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কক্ষ ও প্রশস্ত জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে

(৭) বিচারপ্রার্থী, সাক্ষী, আইনজীবী, সরকারি আইন কর্মকর্তা এবং আইনজীবী সহকারিদের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

(৮) প্রস্তাবিত স্থায়ী সরকারি অ্যাটর্নি সার্ভিসের জন্য পর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

(৯) বিচারপ্রার্থীদের সুবিধার্থে আদালত ভবনের নিচতলায় 'ইনফরমেশন ডেস্ক' স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোনো রকম পদ সৃজন না করেও বিদ্যমান অবস্থায় এরূপ ইনফরমেশন ডেস্ক চালু করা সম্ভব। তবে ইনফরমেশন ডেস্কে নিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

(১০) বিচারকদের আবাসনের জন্য জেলা পর্যায়ে পৃথক জুডিসিয়াল কমপ্লেক্স স্থাপন করতে হবে।

(১১) আদালতে আগত নারী ও শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্ধারণসহ পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। ন্যায়কুঞ্জ প্রকল্পের আদলে আরো বিস্তৃত পরিসরে বিশ্রামাগার নির্মাণের জন্য নতুন করে একটি প্রকল্প জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পঞ্চদশ অধ্যায়: আদালত ব্যবস্থাপনা
প্রথম পরিচ্ছেদ: সুপ্রীম কোর্ট ব্যবস্থাপনা

১. ভূমিকা

সুপ্রীম কোর্টের নিজস্ব প্রতিবেদন অনুযায়ী ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ২৮,৯০১ এবং হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৫,৭৭,২৮০। এই দুই বিভাগে কর্মরত বিচারকের সংখ্যার সাথে বিচারাধীন মামলার এই সংখ্যার তুলনা করলে উচ্চতর আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার কারণ অনুধাবন করা যায়। সুতরাং, একটি কার্যকর বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে মামলা ব্যবস্থাপায় উল্লেখযোগ্য সংস্কার অপরিহার্য।

২. সুপ্রীম কোর্টে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা ও সমস্যা

হাইকোর্ট বিভাগে দেওয়ানী, ফৌজদারি, রিট ও আদি এখতিয়ারভুক্ত মামলার নিষ্পত্তি নানা কারণে বিলম্বিত ও বিঘ্নিত হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

(ক) মামলার নোটিশ জারির ক্ষেত্রে বিলম্ব ও কার্যকর তদারকির অভাব;
(খ) নিম্ন-আদালতের রেকর্ড সময়মত মামলার মূল নথির সাথে সামিল না হওয়া;
(গ) আদালতের প্রাথমিক আদেশে (অর্থাৎ, রুল-জারির আদেশে) নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে প্রতিপক্ষের জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা না থাকা, যার ফলে মামলা গৃহীত হওয়ার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও প্রতিপক্ষ তার জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকে;
(ঘ) মামলায় জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে সরকার পক্ষের দীর্ঘসূত্রিতার প্রবণতা এবং এক্ষেত্রে আদালতের তদারকির অভাব;
(ঙ) অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ বারংবার বাড়ানোর ক্ষেত্রে আদালতের তদারকির অভাব;
(চ) বেঞ্চ পুনর্গঠন বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকা, এবং এর ফলে, প্রতিবার বেঞ্চ পুনর্গঠনের সময় চূড়ান্ত শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত মামলা তালিকাচ্যুত হওয়া;
(ছ) আদালতের আদেশ ও রায় স্বাক্ষর হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব;
(জ) মামলার বিভিন্ন পর্যায়ে আদালতের সহায়ক কর্মচারিদের অসহযোগিতা ও অবহেলা;
(ঝ) মামলার আবেদনকারি বা আপীলকারি পক্ষ চূড়ান্ত শুনানির সময় অনুপস্থিত থাকা এবং অনুপস্থিতিজনিত কারণে মামলা খারিজ (dismissed for default) হওয়ার পর তা আবার পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সময়ক্ষেপণ করা; ইত্যাদি।

আপীল বিভাগে মামলার দীর্ঘসূত্রিতার কারণ এবং মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উদ্ভুত বিপত্তিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

(ক) অধিকাংশ সময় শুনানির জন্য একাধিক বেঞ্চ না থাকা, ফলে মামলা নিষ্পত্তির হার ও গতি আশানুরূপ না হওয়া;
(খ) চেম্বার আদালতে মামলার অতিরিক্ত চাপ, ফলে অন্তবর্তীকালীন আদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ শুনানির সুযোগ না থাকা;
(গ) এক পক্ষের বক্তব্য শুনে হাইকোর্ট বিভাগ প্রদত্ত রায় বা আদেশের কার্যকারিতা স্থগিতের ব্যবস্থা (অনেক ক্ষেত্রে কেভিয়েট (caveat) থাকা সত্ত্বেও);
(ঘ) সময়সীমা পার হওয়া সত্ত্বেও সরকার পক্ষ কর্তৃক আপীল বা রিভিউ আবেদন দায়েরের প্রবণতা;
(ঙ) আদেশ বা রায় একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে স্বাক্ষর না হওয়া,
(চ) রিভিউ আবেদন দাখিল করে কোন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ না থাকা সত্ত্বেও মামলার বিষয়কে জিইয়ে রাখা, ইত্যাদি।

এছাড়া, সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে মামলা দায়েরের জন্য যথেষ্ট কারন না থাকা সত্ত্বেও মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে আবেদনকারিপক্ষের বিরুদ্ধে যথাযথ আদেশ প্রদানের (যেমন, মামলার খরচ প্রদানের আদেশ) প্রচলন

নেই। এর ফলে প্রতিনিয়ত অপ্রয়োজনীয় ও ভিত্তিহীন মামলা দায়ের হচ্ছে, অথচ এর জন্য দায়ী পক্ষের কোন ফলভোগ করতে হচ্ছেনা।

৩. বিদ্যমান সংস্কার উদ্যোগ

মামলা দায়ের, পরিচালনা ও নিষ্পত্তির বিভিন্ন পর্যায়ে সম্প্রতি কিছু সংস্কার সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে, যার ইতিবাচক ফল বিচারপ্রার্থীরা ইতিমধ্যেই লাভ করছেন। এর মধ্যে রয়েছে:

(ক) অনলাইনে মামলা-তালিকা (cause-list) প্রকাশ এবং মামলার রেকর্ড (case-record) প্রাপ্তির সুবিধা;
(খ) আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের কিছু রায় অনলাইনে সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব-পোর্টালে প্রকাশ;
(গ) হাইকোর্টে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা দায়েরের সময় প্রযুক্তির সহায়তায় টোকেন পদ্ধতির মাধ্যমে মামলার এন্ট্রি (entry) ও এভিডেভিটের ব্যবস্থা;
(ঘ) বেঞ্চ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির আওতায় আংশিকশ্রুত মামলা শুনানির তালিকায় অব্যাহত রাখা, ইত্যাদি।

৪. সুপারিশকৃত পদক্ষেপ: সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের আদালত ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও কার্যকরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১ হতে ১৫ উপ-অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হলো।

(১) শুনানির জন্য মামলা প্রস্তুতকরণে বিলম্ব হ্রাস

(ক) মামলার নোটিশ জারির দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্ট ও ডাক বিভাগের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার ভিত্তিতে ডাক বিভাগের উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত করা যেতে পারে, যেন নোটিশ জারির পর সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নোটিশ ফেরৎ আসার সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া যায় এবং উক্ত সময়ের পর শুনানির জন্য প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

(খ) আদালতের প্রশাসনিক কার্যালয় স্ব–উদ্যোগে কোন তদবির ছাড়াই মামলা শুনানির জন্য প্রস্তুত করবে এবং তা করতে ব্যর্থ হলে যাতে তাদের জবাবদিহির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রারদের নেতৃত্বে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রশাসনিক কার্যালয় ও সেখানে রক্ষিত রেজিস্টারগুলো পরিদর্শন করবে এবং নোটিশ জারি ও মামলা প্রস্তুতকরণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা করবে।

(২) অনলাইনে মেনশন-স্লিপ

(ক) অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ বাড়ানো বা চূড়ান্ত শুনানির জন্য মামলা তালিকাভুক্ত করার জন্য মেনশন-স্লিপ (mention slip) অনলাইনে জমা নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যেন আদালতে লাইনে দাঁড়িয়ে মেনশন-স্লিপ জমা দেয়ার জন্য আইনজীবীদের ও আদালতের সময় নষ্ট না হয়।

(খ) অনলাইনে মেনশন-স্লিপ জমা দেয়ার ক্রম অনুসারে কার্যতালিকায় মামলা অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে, যেন এক্ষেত্রে শৃঙ্খলা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

(৩) বেঞ্চ পুনর্গঠন বিষয়ে নীতিমালা প্রনয়ণ

(ক) হাইকোর্ট বিভাগের বেঞ্চ গঠন ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, যেন কোন্ কোন্ বিবেচ্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বেঞ্চ গঠন এবং পুনর্গঠন করা হবে, সেবিষয়ে বিচারক, আইনজীবী এবং বিচারপ্রার্থীদের একটি স্পষ্ট ধারণা থাকে।

(খ) কোনো বেঞ্চ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিচারক বা বিচারকদের একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের আগেই এসম্বন্ধে অবহিত করকে হবে, যেন তিনি বা তাঁরা রায় প্রদানের জন্য অপেক্ষমান বা আংশিকশ্রুত বা কার্যতালিকায় শুনানির জন্য নির্দিষ্টকৃত মামলাগুলোর ব্যাপারে বেঞ্চ পুনর্গঠনের আগেই যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারেন।

(গ) এমনভাবে বেঞ্চ পুনর্গঠন করতে হবে যেন তার ফলে রায়ের জন্য অপেক্ষমান এবং আংশিকশ্রুত মামলাগুলো নিষ্পত্তির পূর্বে বেঞ্চের পুনর্গঠন কার্যকর না হয়।

(৪) মামলা নিবন্ধনে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ

(ক) বর্তমানে হাইকোর্ট বিভাগে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা নিবন্ধন এবং এভিডেভিটের ক্ষেত্রে মামলা জমা দেয়ার ক্রম অনুসারে সেবা প্রদানের জন্য স্বয়ংক্রিয় যে টোকেন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে, সে ব্যবস্থায় অন্যান্য ধরনের মামলার, বিশেষত: রিট আবেদন নিবন্ধনও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(খ) কোম্পানি ও এডমিরালটি অধিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কাগজ–বিহীনভাবে অনলাইনে মামলা দায়েরের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তা ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ধরনের মামলার ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব প্রয়োগ করতে হবে।

(৫) অনলাইনে মামলার ফলাফল, আদেশ ও রায় প্রকাশ

(ক) অনলাইন কার্যতালিকায় অল্প কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে (যেমন, 'Rule Issued', 'Rule and Stay', 'Not Pressed', 'Rule made absolute', 'Rule Discharged', 'Adjourned till ...', ইত্যাদি) মামলায় প্রদত্ত রায় বা আদেশ তাৎক্ষনিকভাবে ওয়েব-সাইটে প্রকাশ করার প্রচলন করতে হবে, যেন সহজেই বিচারপ্রার্থীরা তাদের মামলার ফলাফল ও অগ্রগতি বিষয়ে জানতে পারেন।

(খ) এক্ষেত্রে বেঞ্চ পরিচালনকারী বিচারকদের নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব পোর্টালের ব্যবহার আরো সম্প্রসারন করতে হবে যেন বিচার প্রক্রিয়া আরো স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমুলক এবং জনবান্ধব হয়।

(ঘ) সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের প্রত্যেকটি আদেশ ও রায়ের ইলেকট্রনিক কপি কিউ-আর কোডসহ অনলাইনে প্রাপ্তিযোগ্য করতে হবে, যেন বিচারপ্রার্থীরা সময়মত ও সহজে তাদের মামলার ফলাফল বিস্তারিত জানতে পারে।

(৬) মামলা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তদারকি

(ক) কোনো মামলায় প্রদত্ত আদেশ (অর্থাৎ, রুল)-এর জবাব দেওয়ার সময়সীমা পার হওয়ার এক বা দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হলে মামলাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঐ বেঞ্চের কার্যতালিকায় (বেঞ্চ পুনর্গঠিত হলে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যকোনো বেঞ্চের কার্যতালিকায়) 'মামলা ব্যবস্থাপনা শুনানি'র জন্য অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে করে আদালত নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করতে পারেন:

১ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মামলার নোটিশ-জারি সম্পন্ন না হলে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান এবং সময়সীমা নির্ধারণ;

২ (প্রযোজ্য হলে) ইতিমধ্যে মামলার প্রাথমিক আদেশ অনুযায়ী নিম্ন-আদালতের নথি উপস্থাপিত না হলে সেই বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ ও সময়সীমা নির্ধারণ এবং আদালতের প্রশাসনিক কার্যালয় (Section)কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান;

৩ ইতিমধ্যে মামলায় রুলের জবাব দাখিল না করা হয়ে থাকলে মামলার প্রতিপক্ষদের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ;

৪ প্রতিপক্ষ জবাব দিয়ে থাকলে এবং আবেদনকারী পক্ষ তার প্রত্যুত্তর দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, সে বিষয়ে সময়সীমা নির্ধারণ;

৫ মামলায় কোনো জরুরি বিষয় থাকলে, যেমন, প্রতিপক্ষ অর্ন্তবর্তীকালীন আদেশ বাতিলের আবেদন জানালে, উক্ত বিষয়ে আবেদনকারীপক্ষের আপত্তি এবং আবেদনপত্রটি নিষ্পত্তির সময়সীমা নির্ধারণ;

৬ কোনো তৃতীয়পক্ষ যদি মামলার পক্ষভুক্ত হতে চায়, সেক্ষেত্রে তা নিষ্পত্তির জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ;

৭ উপযুক্ত ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা বা সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে, অর্থ্যাৎ বিকল্প পদ্ধতিতে, বিরোধ নিরসনের লক্ষ্যে পক্ষদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করা;

৮ পরবর্তী মামলা ব্যবস্থাপনা শুনানির সময় নির্ধারণ, অথবা ক্ষেত্রবিশেষে, মামলার চূড়ান্ত শুনানির সম্ভাব্য তারিখ এবং শুনানির দৈর্ঘ্য নির্ধারণ;

৯ চূড়ান্ত শুনানির তারিখ বিষয়ে আদেশের অংশ হিসেবে পক্ষদের অভিন্ন তথ্যমূলক বক্তব্য (agreed statement of facts) উপস্থাপন এবং তারা যেসব আইন ও নজিরের (case-law) উপর নির্ভর করবে সেগুলোর তালিকাসহ তাদের যুক্তির লিখিত সার-সংক্ষেপ উপস্থাপনের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ;

১০ মামলা নিষ্পত্তির জন্য প্রাসঙ্গিক অন্যান্য নির্দেশ প্রদান ইত্যাদি।

(খ) উপরিউক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য হাইকোর্ট রুলস-এর সংশোধন করতে হবে। উক্ত সংশোধনী প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্ট রুলস-এর Chapter IIIA-এর অধীনে এব্যাপারে হাইকোর্ট রুলস-এর প্র্যাকটিস ডিরেকশন জারি করা যেতে পারে।

(৭) মামলার গুণাগুণ বিবেচনা করে রায় প্রদান

(ক) বর্তমানে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অনুপস্থিতিজনিত কারণে মামলা খারিজ (Dismissed for default) করার পরিবর্তে মামলার গুনাগুনের ভিত্তিতে (on merits) রায় প্রদান করতে হবে, যেন মামলা পুনরুদ্ধারের (restore) আবেদন করার কৌশল প্রয়োগ করে সময়ের অপচয় বন্ধ হয়।

(খ) এই সমস্যা নিরসনের জন্য কমিশনের প্রস্তাব হলো, প্র্যাকটিস ডিরেকশন জারির মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকদের এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া, যেন:

(অ) আবেদনকারি বা আপিলকারিপক্ষ চূড়ান্ত শুনানির জন্য মামলা গ্রহনের প্রথম দিন অনুপস্থিত থাকলে পরবর্তী দিনের কার্যতালিকায় বিষয়টিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে আইনজীবীর নাম উল্লেখপূর্বক (বা ব্যক্তিগতভাবে মামলা পরিচালনা করা হলে, তা উল্লেখপূর্বক) শুনানি পরিচালনার শেষ সুযোগ দেওয়া হয়; এবং

(আ) পরবর্তী দিনও আইনজীবীর অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করে এবং, ক্ষেত্রমত, মামলার প্রতিপক্ষের উপস্থাপিত বক্তব্য শুনে, মামলার গুণাগুণের ভিত্তিতে (on merits) রায় প্রদান করা হয়।

(৮) রায় ও আদেশ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বাক্ষর

(ক) হাইকোর্ট রুলস-এর সংশোধনের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত সময়সূচি বাস্তবায়ন করতে হবে:

(ক) হাইকোর্ট বিভাগের কোনো মামলায় প্রদত্ত প্রাথমিক আদেশ (rule / interim order) ঘোষণার পর সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে এবং আদেশ ঘোষণার ক্রম অনুযায়ী স্বাক্ষর ও প্রকাশ করতে হবে;

(আ) দো-তরফা শুনানির পর অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ ঘোষণার সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে স্বাক্ষর ও প্রকাশ করতে হবে;

(খ) সুপ্রীম কোর্টের কোনো রায় ঘোষণার পর সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে তা স্বাক্ষর ও প্রকাশ করতে হবে;

(গ) কোনো বিচারক (প্রধান বিচারপতিসহ) অবসরে যাওয়ার পূর্বে (প্রয়োজনে বিচারকার্য থেকে বিরত থেকে) তাঁর প্রদত্ত সকল আদেশ ও রায় চূড়ান্ত করবেন ও স্বাক্ষর করবেন; অর্থাৎ, অবসর গ্রহণের পর কোনো বিচারক কোনো রায় বা আদেশ স্বাক্ষর করবেন না।

(খ) উপরিউক্ত সময়সীমা অনুসরণ করা না হলে সংশ্লিষ্ট বিচারককে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

(৯) হাইকোর্ট বিভাগের নজরদারি কমিটির ভুমিকা

(ক) এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, হাইকোর্ট রুলস-এর অধ্যায় ১, বিধি ৭বি অনুযায়ী গঠিত নজরদারি কমিটি নিম্নবর্ণিত দায়িত্বগুলো নিয়মিত পালন করে:

(ক) দীর্ঘদিন ধরে বিচারাধীন বিভিন্ন ধরনের মামলার সংখ্যা নিরূপণ করা;
(আ) যে সব মামলা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন সেগুলো সনাক্ত করা এবং সেগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা;
(খ) যে সব মামলা শুনানির জন্য প্রস্তুত কিন্তু কার্যতালিকায় তালিকাভুক্ত হয়নি, সেগুলোকে চিহ্নিত করা এবং সেই বিষয়ে প্রধান বিচারপতির কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা;
(গ) বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিষয়ে সুপারিশ করা;
(ঘ) মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সমস্যা ও বাধাগুলোকে সনাক্ত করা এবং প্রধান বিচারপতির কাছে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা, ইত্যাদি।

(খ) প্রতি পঞ্জিকা বছরে এই কমিটির অন্তত পক্ষে তিনটি সভা করার যে বিধান রয়েছে, তার প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

(১০) হাইকোর্ট বিভাগে অপ্রয়োজনীয় মামলা হ্রাস

(ক) নতুন মামলা গ্রহণ সংক্রান্ত শুনানির সময় মামলার অনুকূলে প্রাথমিকভাবে (*prima facie*) যদি আবেদনকারী বা আপীলকারীপক্ষ যুক্তি উপস্থাপন করতে সফল না হন, সেক্ষেত্রে আদালতের মামলায় রুল দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, যাতে করে একটি অপ্রয়োজনীয় মামলার সৃষ্টি না হয়।

(খ) রুল জারি হওয়ার পর প্রতিপক্ষের দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনায় এবং উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের পর আদালত যদি সন্তুষ্ট হন যে, পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য উপস্থাপন ব্যতিরেকে এবং অত্যন্ত দুর্বল ভিত্তির উপর মামলা দায়ের করা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে আবেদনকারী/আপীলকারীর বিরুদ্ধে মামলার খরচ প্রদানের আদেশ (cost order) প্রদান করতে হবে, এবং প্রতিপক্ষের নির্বাহ করা প্রকৃত খরচ পরিশোধের আদেশ প্রদান করতে হবে ।

(গ) উপরিউক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রধান বিচারপতি কর্তৃক যথাযথ প্র্যাকটিস ডিরেকশন জারি করতে হবে।

(১১) আপীল বিভাগের চেম্বার-এ শুনানি ও আদেশ

(ক) আপীল বিভাগের চেম্বারে একক বিচারক কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা নিরসনের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করতে হবে:

(অ) হাইকোর্ট বিভাগের কোন আদেশ বা রায়ের বিরুদ্ধে চেম্বার বিচারক বা নিয়মিত বেঞ্চ কর্তৃক আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগে প্রতিপক্ষের যে আইনজীবী মামলা পরিচালনা করেছিলেন, তাঁকে নোটিশ দিতে হবে। আপীল বিভাগে কেভিয়েট (caveat) দাখিলের বিধান বিলোপ করতে হবে।

(আ) হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ বা রায়ের কার্যকারিতার বিষয়ে সাধারণত আপীল বিভাগের চেম্বার বিচারক স্থগিতাদেশ প্রদান থেকে বিরত থাকবেন এবং এ ধরণের বিষয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়মিত বেঞ্চে প্রেরণ করবেন।

(ই) শুধুমাত্র অতিজরুরি কোন কারণ থাকলে (যেমন, মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত বা দোষী-সাব্যস্ত ব্যক্তির খালাস বা জামিন, উচ্ছেদের আদেশ, ইত্যাদি) তা উল্লেখপূর্বক চেম্বার বিচারক একটি সাময়িক স্থগিতাদেশ দিতে পারবেন, তবে আপীল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে স্থগিতাদেশের আবেদন আবার নতুনভাবে বিবেচনা করা হবে, এবং এক্ষেত্রে চেম্বার বিচারক প্রদত্ত আদেশ বা আদেশদানে অসম্মতি নিয়মিত বেঞ্চের বিবেচ্য হবে না।

(১২) খরচের আদেশ দেওয়ার প্রচলন

(ক) অপ্রয়োজনীয় লিভ আবেদন শুনানির ক্ষেত্রে আপীল বিভাগ কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে আবেদন খারিজ করার পাশাপাশি খরচের আদেশ দেয়ার রীতি প্রচলন করতে হবে, যেন করে দুর্বল আইনগত ভিত্তির উপর নির্ভর করে লিভ পিটিশন দায়ের করার প্রবণতা হ্রাস পায়।

(১৩) লিভ পিটিশন ও রিভিউ পিটিশনের অজুহাতে সময়ক্ষেপণ

(ক) আপীল বিভাগে বিচারাধীন লিভ পিটিশনের অধীনে হাইকোর্ট বিভাগের রায় বা আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত না থাকা সত্ত্বেও এই অজুহাতে যাতে কেউ রায় বা আদেশ বাস্তবায়নে গড়িমসি করতে না পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে।
(খ) একই ভাবে রিভিউ পিটিশন বিচারাধীন থাকার অজুহাতে আপীল বিভাগ প্রদত্ত রায় বা আদেশের বিষয়ে কোন স্থগিতাদেশ না থাকলেও, তা কার্যকর ও বাস্তবায়ন করা থেকে কেউ যাতে বিরত না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে।
(গ) এ উদ্দেশ্যে আপীল বিভাগের এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা জারি করতে হবে। সাধারণভাবে সুপ্রীম কোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের প্রকৃতি ও বাস্তবায়নের বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে হবে ।

(১৪) আপীল বিভাগে আইনজীবী নিবন্ধন

(ক) আপীল বিভাগে এ্যাডভোকেট, এ্যাডভোকেট–অন–রেকর্ড এবং সিনিয়র এ্যাডভোকেট হিসেবে নিবন্ধনের বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান প্রণয়ন করতে হবে, যাতে করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মামলা পরিচালনা ও অন্যান্য ভূমিকা পালনের জন্য বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ডের ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও প্রশ্নাতীত প্রক্রিয়ায় আইনজীবীদের নিবন্ধন প্রদান করা হয়।

(১৫) ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলায় ম্যানুয়াল তৈরি ও প্রকাশ

(ক) সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় আদালত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ম্যানুয়াল তৈরি করে তা সংশ্লিষ্টদের সরবরাহ করতে হবে যেন বিচারক, আইনজীবী, আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ বিচারপ্রার্থী জনগণ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারেন ও সে অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনা

১. ভূমিকা

বর্তমানে বিচারাধীন প্রায় ৪৩ লাখ মামলার অধিকাংশ (প্রায় ৩৮ লাখ) নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে অধস্তন আদালতে। এসব মামলা নিষ্পত্তির জন্য রয়েছে নানাবিধ আইন, বিভিন্ন স্তরের আদালত ও জনবল। কিন্তু এত আয়োজন থাকা সত্ত্বেও এগুলোর সুসমন্বিত ব্যবহারের ক্ষেত্রে রয়ে গেছে ত্রুটি, যা আদালত ব্যবস্থাপনার একটি দুর্বল দিক।

সুপারিশকৃত পদক্ষেপঃ আদালত ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও কার্যকরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২ হতে ১৪ অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হলো।

২. দৈনন্দিন বিচারিক কার্যক্রম বিষয়ক ব্যবস্থাপনা

অধস্তন আদালতের বিচার ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক বিচারককে নিম্নের বিষয়গুলোর উপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যথাঃ

(ক) মামলা দাখিল পর্যায়ে বিচারক কর্তৃক নিরীক্ষণঃ বিচারক কর্তৃক কোনো মামলা পরবর্তী ধাপে অগ্রবর্তী করার আগে মামলাটির 'রক্ষণীয়তা' সংশ্লিষ্ট দিকগুলো নিরীক্ষা এবং প্রয়োজনে শুনানি গ্রহণ করে অরক্ষণীয় মামলাগুলো খারিজ করার আদেশ দেয়া একান্ত প্রয়োজন। অনুরূপভাবে অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির ২০২ ও ২০৩ ধারার এখতিয়ার প্রয়োগ করবেন যেন এখতিয়ার বহির্ভূত বা মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলায় অপরাধ আমলে গ্রহণ করা না হয়।

(খ) ডায়রি ও কজলিস্টঃ প্রচলিত হার্ডকপি ভিত্তিক কজলিস্টের পাশাপাশি প্রত্যেক আদালতের একটি ডিজিটাল কজলিস্ট সংরক্ষণ করা এবং সঠিক তথ্যসহ তা প্রতিদিন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা জরুরি। যেহেতু কাগজের তৈরি কজলিস্ট আদালতে সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেহেতু যতদিন না আইন সংশোধিত হচ্ছে, ততদিন ডিজিটাল কজলিস্টে সমস্ত মামলার এন্ট্রি প্রদানের পর দিন শেষে তার একটি হার্ডকপি প্রিন্ট দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে যেন আইনী বাধ্যবাধকতা পূরণ হয়।

(গ) দৈনিক নথি প্রাপ্তিঃ কোনো নির্দিষ্ট দিনে শুনানির জন্য কজ লিস্টে উল্লিখিত মামলার নথি আগের দিন সেরেস্তা বা অন্যত্র থেকে প্রাপ্তি এবং তা আদালতে উপস্থাপিত হওয়ার বিষয়টি বিচারককে নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) প্রতিটি নথি বিষয়ে উন্মুক্ত আদালতে সিদ্ধান্ত ঘোষণা ও জারি

আদালতের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিচারককে Code of Civil Procedure, Code of Criminal Procedure, Civil Rules and Orders এবং Criminal Rules and Orders সহ অন্যান্য আইনের নির্দেশনার আলোকে প্রতিটি মামলায় প্রদত্ত রায় ও আদেশ উন্মুক্ত এজলাস কক্ষে ঘোষণা করতে হবে।

(ঙ) প্রতিদিনের সিদ্ধান্ত সন্ধ্যা ৬.০০ টায় ওয়েব সাইটে প্রকাশ

বিচার প্রার্থীদের মামলার ফলাফল জানার অধিকার রয়েছে। তাই জনগণ যেন আদালতে না গিয়েও ঘরে বসে তাদের মামলার ফলাফল জানতে পারেন সে উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত হবার সাথে সাথে ডিজিটাল কজলিস্টে মামলার ফলাফল উল্লেখপূর্বক তা জেলা আদালতের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং ওই একই দিন সন্ধ্যা ছটার মধ্যে রায় বা আদেশের পিডিএফ কপি ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।

(চ) প্রসেস জারি ও রেকর্ডভুক্ত করা

বিচার প্রক্রিয়ায় এটি একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। মামলার আরজি/ দরখাস্ত/ অভিযোগ দাখিল এবং তার গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে শুনানির পরের বিষয়টি হচ্ছে প্রসেস জারি। এ প্রক্রিয়ায় বাদী/ অভিযোগকারী কর্তৃক রিকুইজিট বা প্রয়োজনীয় সমন, নোটিশ, আরজি/দরখাস্তের সংক্ষিপ্তসারসহ আইন নির্ধারিত খরচ দাখিল করার পর প্রসেস জারি করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত তিনটি পদ্ধতি হচ্ছে আদালতের জারিকারক, রেজিস্টার্ড পোস্ট এবং কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রসেস জারি করা। এসব পদ্ধতি ছাড়াও যথাযথ মামলায় যেমন চুক্তিভিত্তিক বাণিজ্য প্রকৃতির মামলায় ইমেইলের মাধ্যমে নোটিশ জারির বিধান যোগ করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে প্রসেস জারির ক্ষেত্রে ডাক বিভাগের দায়-দায়িত্ব বিষয়ে পোস্ট অফিস অ্যাক্ট, ১৮৯৮ এর ধারা ৩৭ (২) এর বিধান অপ্রতুল ও অস্পষ্ট। কুরিয়ার সার্ভিসের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব সম্পর্কেও সিপিসি তে বিধান নাই। তাই এই সকল আইন সংশোধন করে প্রসেস জারির পদ্ধতি সহজ করতে হবে এবং যারা প্রসেস জারির সাথে যুক্ত থাকবেন, তাদের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।

(ছ) অন লাইনে সরকারি সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ

বর্তমানে আইন সংশোধনের মাধ্যমে অনলাইনে সাক্ষ্য গ্রহণকে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। ফৌজদারি মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং ডাক্তার সাক্ষীর সাক্ষ্যসহ শতভাগ ক্ষেত্রে অন্যান্য সরকারি কর্মচারি সাক্ষ্য সুপ্রীম কোর্টের গাইড লাইন অনুসারে অনলাইনে গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(জ) নকল প্রাপ্তি

আইনের বর্তমান বিধান হচ্ছে নির্ধারিত ফোলিওতে মূল রায় বা আদেশ ফটোকপি করে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তা প্রত্যায়িত করা হলেই সেটি নকল হিসেবে গৃহীত হবে। নকলের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারককে এ বিষয়টি তদারকি করতে হবে যেন দ্রুততম সময়ে বিচারপ্রার্থী জনগণ সরকার নির্ধারিত খরচে নকল সরবরাহ পেতে পারেন ।

(ঝ) রেকর্ডরুমে নথি প্রেরণ

বিচার আদালতে নথির কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তা রেকর্ডরুমে প্রেরণ করতে হবে এবং রেকর্ডরুমে সেটি যথাযথ পদ্ধতিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারককে প্রতিনিয়ত তদারক করতে হবে।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপঃ**

১. জেলা পর্যায়ের আদালতের ওয়েব সাইটে ডিজিটাল কজলিস্ট সংরক্ষণ ও প্রকাশের বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগ রুলস এর অধ্যায় IIIB এর বিধি ১ অনুসারে প্র্যাকটিস ডাইরেকশন জারি করতে হবে।

২. আদালতের ডায়রিতে প্রতিদিন শুনানির জন্য ততগুলো মামলা রাখতে হবে যতগুলোর শুনানি করা বা সাক্ষ্যগ্রহণ করা একজন বিচারকের পক্ষে সম্ভব।

৩. দেওয়ানি কার্যবিধি সংশোধনের মাধ্যমে কুরিয়ার সার্ভিসের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে।

৪. দেওয়ানি কার্যবিধি ও পোস্ট অফিস আইন, ১৮৯৮ সংশোধনক্রমে রেজিস্টার্ড পোস্ট বিষয়ে ডাক বিভাগ কর্তৃক প্রতিবেদন প্রদানসহ ডাক বিভাগের অন্যান্য দায়িত্ব বিষয়ে বিধান করতে হবে।

৫. সুপ্রীম কোর্ট থেকে জারিকারকদের দায়িত্ব বিষয়ে প্র্যাকটিস ডাইরেকশন ইস্যু করতে হবে ।

৬. জারিকারকদের জন্য মান সম্মত টিএ/ডিএ এর ব্যবস্থা করতে হবে বা বিকল্প হিসেবে পক্ষগণ কর্তৃক জারিকারকদের খরচ জমা দেওয়ার বিষয়ে বিধান করতে হবে।

৪. জনবল, অবকাঠামো ও সরঞ্জামাদি

(ক) পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ এবং উহার সঠিক ব্যবহার

বিচার ব্যবস্থায় ভূমিকা পালনকারী গোষ্ঠীগুলো হচ্ছে– ১. বিচারক, ২. আইনজীবী, ৩. বিচারের পক্ষগণ, ৪. আদালতের সহায়ক জনবল, ৫. তদন্ত সংস্থা এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্য এবং ৬. আইনজীবী সহকারিগণ।

এদের মধ্যে দেশের সকল স্থানে পর্যাপ্ত আইনজীবী ও আইনজীবী সহকারি থাকলেও বিচারক, সহায়ক জনবল, তদন্ত সংস্থা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ঘাটতি থাকায় অনেক সময় মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়। তবে আইনজীবীদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততা একইভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। একই সমস্যা রয়েছে আইনজীবী সহকারিদের বিষয়েও।

এ অবস্থায় প্রতিটি আদালতে মঞ্জুরিকৃত পদের বিপরীতে বিচারকসহ যোগ্যতার ভিত্তিতে সহায়ক জনবল নিয়োগ করতে হবে। এছাড়াও দেশের প্রতিটি আদালতে ইনফরমেশন টেকনোলজি বিষয়ে সাপোর্ট প্রদানের জন্য এ সংক্রান্ত পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের উক্ত পদে নিয়োগ করতে হবে।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপঃ**

১. আইনজীবীদের সনদ প্রাপ্তির পদ্ধতির উন্নয়ন;
২. দেশের প্রতিটি আদালতে প্রোগ্রামারসহ অন্যান্য আইটি স্পেশালিস্ট এর পদ সৃজন এবং উক্ত পদে যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান;
৩. আইনজীবী সহকারিদের আইনী স্বীকৃতিসহ যোগ্যতা নির্ধারণ এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) জনবলের দায়িত্ব নির্দিষ্টকরণ

সহায়ক জনবল তাদের কর্মদক্ষতার সবটুকু যেন বিচার প্রশাসনের কাজে ব্যয় করেন, সে বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাদের প্রত্যেককে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে ডিউটি কার্ড তৈরি করে তাদের কর্মস্থলে রাখতে হবে। এছাড়াও তাদেরকে আরো কর্মদক্ষ করার জন্য সময় সময়ে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(গ) আদালতে জুডিসিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (JAO) এর পদ সৃষ্টি

দেশের বিভিন্ন আদালতে কাজের পরিমাণ ও ধরনে ভিন্নতা রয়েছে। কোনো কোনো আদালতে বিশেষ করে বিভাগীয় এবং বড় শহরগুলোতে প্রচুর মামলা সমনজারিসহ চূড়ান্ত শুনানির পূর্বের বিভিন্ন স্তরে দীর্ঘদিন আটকে থাকে। আবার ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে আদালতে সাক্ষী ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সকল বিষয় দেখভাল করার জন্য আদালতের যে সকল সহায়ক কর্মচারি কাজ করেন, তারা যথেষ্ট পারদর্শী নন বিধায় প্রতিটি কাজে প্রচুর সময় ব্যয় হয়। আবার সহায়ক জনবলের কর্মকাণ্ড তদারকির জন্য জজশিপ ও ম্যাজিস্ট্রেসিতে জাজ ইনচার্জ নেজারতসহ অন্যান্য যে সকল বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তা কাজ করেন, তাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব আদালতের বিচারিক কাজ শেষে এসব বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হয়। সুতরাং তাঁরাও এ বিষয়ে যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। এই কারণে যে সকল জেলায় মামলাজটের পরিমাণ বেশি সেকল জেলায় Judicial Administrative Officer (JAO) এর পদ সৃষ্টি করে সেখানে সিনিয়র সহকারি জজ/সহকারি জজ পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে যারা বিচার কাজ করবেন না, কিন্তু সাক্ষী ব্যবস্থাপনাসহ আদালত ব্যবস্থাপনার অন্যান্য প্রশাসনিক দিক সরাসরি তদারকি করবেন। প্রয়োজন বোধে যে সকল মামলা বিকল্প পদ্ধতিতে নিষ্পত্তির সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিচার আদালত মনে করবেন, সে সব মামলা এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য JAO এর কাছে পাঠানো যেতে পারে। কাজের পরিমাণ ভেদে একটি জজশিপ বা ম্যাজিস্ট্রেসিতে এক বা একাধিক JAO এর পদ সৃষ্টি করতে হবে। এডিআরের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি ছাড়াও JAO নিম্নোক্ত দপ্তরগুলোর কাজের তদারকি করবেন:

(অ) নেজারত
(আ) নকল খানা
(ই) মালখানা
(ঈ) রেকর্ডরুম
(উ) হাজতখানা
(ঊ) জজশিপ বা ম্যাজিস্ট্রেসির প্রধান কর্তৃক আরোপিত প্রশাসনিক প্রকৃতির অন্যান্য দায়িত্ব

উল্লেখ্য যে, পদ সৃজন একটি দীর্ঘ মেয়াদি প্রক্রিয়া। তাই যতদিন না পদ সৃজন হচ্ছে, ততদিন যে সকল জজশিপ বা ম্যাজিস্ট্রেসিতে JAO এর প্রয়োজন আছে মর্মে চিহ্নিত করা হবে, সেকল স্থানে JAO পদে নিয়োগ প্রদানের জন্য প্রথমে অফিসারকে আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত করতে হবে। অতঃপর সেই সংযুক্ত কর্মকর্তাকে উক্ত জজশিপ বা ম্যাজিস্ট্রেসিতে JAO এর দায়িত্ব পালনের জন্য ন্যস্ত করতে হবে। অফিসারের বেতন-ভাতা আইন ও বিচার বিভাগ হতে হবে। এভাবে JAO পদে নিয়োগের জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ঘ) অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করা

জেলা পর্যায়ের অনেক আদালতে অবকাঠামোগত স্বল্পতা আছে। অনেক ক্ষেত্রে বিচারকদের এজলাস ভাগাভাগি করতে হয়। এ সমস্যা সমাধানে চতুর্দশ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে যা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

(ঙ) পর্যাপ্ত অফিস সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা

দেশের বিভিন্ন আদালতে বিভিন্ন ফরম, অর্ডারশীট, সাক্ষ্য রেকর্ডকরণের ফরমসহ কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার ইত্যাদি অফিস সরঞ্জামাদির মজুত শেষ হওয়ার পূর্বেই তা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. আদালতের রেজিস্টার ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ

অধস্তন আদালতে সংরক্ষণযোগ্য রেজিস্টারগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে যেন একটি প্রধান রেজিস্টার (যেমন স্যুট রেজিস্টার) থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য অন্যান্য রেজিস্টারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়। এতে বিভিন্ন রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় তথ্য খুব কম সময়ে ইনপুট দেওয়া এবং সময়মত তথ্য খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। আইনের বাধ্যবাধকতা থাকায় প্রয়োজনে প্রতিদিন রেজিস্টারে তথ্য ইনপুট দেওয়ার পর তা প্রিন্ট করে বাধাই ভলিউম এ সংরক্ষণ করতে হবে।

৬. সিকিউরিটি/মার্শাল সার্ভিসের প্রচলন

আদালতের নিরাপত্তা বিধান এবং উহার রায় ও আদেশ কার্যকর করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের অনুকরণে অধস্তন আদালতে মার্শাল সার্ভিসের প্রচলন করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে জেলা জজ ও সিজেএম এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পুলিশের একটি চৌকস দল প্রতিটি আদালতে নিয়োগ করতে হবে যাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন বা এসিআর জেলা জজ বা সিজেএম এর হাতে থাকবে। মার্শাল সার্ভিসে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যগণ বিচারকগণের নিরাপত্তা বিধানসহ মামলার রায় ও আদেশ বাস্তবায়নে আদালতের নির্দেশ মত কাজ করবে।

এ ব্যবস্থা চালুর ফলে একদিকে আদালতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেমন সম্ভব হবে তেমনি জারি মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা যাবে।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:**

আদালতের জনবল কাঠামোতে সিকিউরিটি/মার্শাল সার্ভিসের কর্মচারিগণকে সংযোজন করতে হবে।

৭. অবকাঠামো এবং স্থানের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

অধস্তন আদালতের কাজে গতিশীলতা আনার জন্য নিম্নোক্ত প্রতিটি অবকাঠামো এবং স্থানের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে:

(ক) অফিস: প্রত্যেক বিচারকের একক ব্যবহারের জন্য আলাদা অফিসকক্ষ থাকবে। এছাড়াও প্রতিটি আদালতে সহায়ক কর্মচারিদের জন্য আলাদা অফিস রুম থাকতে হবে।

(খ) বিচারকের চেম্বার ও আদালত কক্ষ: প্রত্যেক বিচারকের জন্য আলাদা চেম্বার ও সংযুক্ত আদালত কক্ষ থাকতে হবে। আদালত কক্ষে আইনজীবী এবং বিচারপ্রার্থী জনগণের বসার সুব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি আদালতের কার্যক্রম সিসিটিভির আওতাভুক্ত থাকতে হবে এবং আইনে বর্ণিত কারণে প্রয়োজন না হলে

আদালতের সকল কার্যক্রম হবে উন্মুক্ত। আদালত কক্ষে সাক্ষীদের বসার এবং দোষী সাব্যস্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত নির্দোষ প্রতীয়মান হতে পারে এমন সুবিধাসম্বলিত ব্যবস্থা আসামীদের জন্য রাখতে হবে।
এছাড়াও তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সাক্ষ্য রেকর্ড করার সুবিধা সকল আদালতে প্রদান করতে হবে যেন, বিচারক চাইলে হাতে সাক্ষ্য রেকর্ড না করে কম্পিউটারে টাইপ করার মাধ্যমে সাক্ষ্য রেকর্ড ও তা প্রিন্ট করতে পারেন।

(গ) নেজারত: প্রতিটি জজশিপ/ ম্যাজিস্ট্রেসির নেজারতের জন্য পর্যাপ্ত স্থান সংরক্ষিত রাখতে হবে।

(ঘ) নকলখানা: প্রতিটি আদালতের নকলখানা এমন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হতে হবে যেন, নকলখানায় কর্মরতদের কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়। নকলখানায় বিস্তারিত তথ্যসহ প্রতিদিনের জমা পড়া নকলের দরখাস্তের সংখ্যা এবং সরবরাহকৃত নকলের সংখ্যা একটি প্রকাশ্যস্থানে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) রেকর্ড রুম: প্রতিটি জজশিপ/ম্যাজিস্ট্রেসী এবং ট্রাইব্যুনালে রেকর্ডরুমের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং উক্ত রেকর্ডরুমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের মাধ্যমে মামলার রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। রেকর্ডরুম ম্যানেজমেন্টের জন্য প্রয়োজনে সফটওয়ার ব্যবহার করতে হবে।

(চ) মালখানা: অনেক আদালতে মালখানায় যথাযথভাবে আলামত না রাখার ফলে সময়মত সেগুলো আদালতে উপস্থাপন করা যায় না। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য প্রতিটি মালখানায় সুশৃঙ্খলভাবে আলামত সাজিয়ে রাখা এবং সময়মত তা আদালতে উপস্থাপন করার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে।

(ছ) কোর্ট হাজত: কোর্ট হাজতে আসামীদের বসার জন্য আসনের সুব্যবস্থা রাখা এবং পান করার জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়া সম্ভব হলে কোর্ট হাজতে হাজতীদের পড়ার জন্য বিভিন্ন উপদেশমূলক বই রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

(জ) ইনফরমেশন ডেস্ক: প্রতিটি জেলার জজশীপে ও ম্যাজিস্ট্রেসিতে কমপক্ষে একটি ইনফরমেশন ডেস্ক থাকতে হবে যন বিচারপ্রার্থী জনগণ আদালতে এসে তাঁদের কাঙ্খিত তথ্য সহজেই পেতে পারেন।

(ঝ) সাক্ষীর বসার জায়গা: বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষীদের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সাক্ষী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দুর্বলতার কারণে অনেক সময় সারাদিন অপেক্ষা করে সাক্ষ্য প্রদান ছাড়াই সাক্ষীরা আদালত প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে। এতে বিচার বিলম্বিত হয়। এই অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য প্রতিটি আদালতে সাক্ষীদের বসার সুর্নিদিষ্ট স্থান সংরক্ষণ করতে হবে এবং উক্ত বসার স্থানে সুপেয় খাবার পানিসহ শৌচাগার ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুব্যবস্থা রাখতে হবে।

(ঞ) ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও মহিলাদের বসার ব্যবস্থা: বিচারের জন্য আদালতে আসা মানুষদের একটি বড় অংশ মহিলা। অনেকের সাথে দুগ্ধপোষ্য শিশুও থাকে। শুনানির জন্য অনেক সময় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের আদালত প্রাঙ্গলে অপেক্ষা করতে হয়। অথচ আদালতে মহিলাদের জন্য বসার এবং কোনো কোনো আদালতে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার এর ব্যবস্থা নেই। সুষ্ঠু আদালত ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে প্রতিটি আদালতে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার, শৌচাগার এবং মহিলাদের বসার সুব্যবস্থা করতে হবে।

৮. সময়ের সদ্ব্যবহার

অধস্তন আদালতের বিচারকদের মাথার ওপর যে বিপুল পরিমাণ মামলা জট আকারে অবস্থান করছে তা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রতিদিনের কর্মঘণ্টার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বিচারক ও আইনজীবীগণকে নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে আগমন করতে হবে এবং দৈনিক কর্মঘন্টার সবটুকু বিচার কাজ পরিচালনায় ব্যবহার করতে হবে।

৯. আদালত পরিদর্শন

জেলা জজ এবং চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রতিটি জেলায় নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন হতে হবে। তাদের অধীনস্ত প্রতিটি আদালত নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং বিচারকের কার্যাবলি তদারকি করতে হবে। আদালত

পরিদর্শনে প্রাপ্ত ভুল ত্রুটি সংশোধনে বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে সেটা সংশোধিত হয়েছে কি না মনিটরিং করতে হবে। এছাড়াও প্রত্যেক বিচারক মাসে একদিন নিজ আদালত পরিদর্শন করবেন।

১০. মাসিক, ত্রৈমাসিক রিপোর্ট সময়মত প্রেরণ

প্রচলিত আইন ও বিধিতে যেরূপভাবে মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্ট বা অন্য আদালতে প্রেরণের কথা উল্লেখ আছে, সেভাবে প্রতিটি আদালতকে উক্ত রিপোর্টগুলো নির্ভুল তথ্যসহ সঠিক সময়ে প্রেরণ করতে হবে। প্রেরিত তথ্য ও রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিয়মিত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবীক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কর্তৃপক্ষের কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে তা সংশ্লিষ্ট আদালতকে জানাতে হবে যেন একই ভুল-ত্রুটি বারংবার না হয়।

১১. ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলায় ম্যানুয়াল তৈরি ও প্রকাশ

সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় আদালত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে ম্যানুয়াল তৈরি করে তা অধস্তন আদালতে সরবরাহ করতে হবে যেন বিচারক, আইনজীবী, আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ বিচারপ্রার্থী জনগণ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারেন ও সে অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।

১২. আদালত প্রাঙ্গনের সিকিউরিটি

আদালতের নিরাপত্তা বিধানের জন্য মার্শাল সার্ভিস চালু করাসহ আদালতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ ও নাইটগার্ড নিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সম্পূর্ণ আদালত প্রাঙ্গণ সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখতে হবে। আইনজীবী, তাদের সহকারিগণ এবং জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আদালত প্রাঙ্গণের একটি নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করতে হবে যেন তাদের অপ্রয়োজনীয় সরব উপস্থিতি বিচারকার্যকে কোনোভাবে ব্যাহত না করে।

১৩. আদালতের পরিচ্ছন্নতা

আদালত প্রাঙ্গণ সব সময় ময়লা আবর্জনা মুক্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সম্ভব হলে আদালতের খোলা স্থানে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ফুলের গাছ লাগাতে হবে। এছাড়াও আদালত কক্ষের বারান্দা ও খোলা জায়গায় যত্রতত্র অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র/আসবাব ফেলে না রেখে সেগুলোর সৌন্দর্য বর্ধন করতে হবে। এছাড়াও বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে যেন সাধারণের ব্যবহারের জন্য আদালত প্রাঙ্গণে নির্দিষ্টকৃত শৌচাগার নোংরা না থাকে এবং মহিলাদের ব্যবহারের জন্য মানসম্মত আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকে।

১৪. কারাগার পরিদর্শন

অধস্তন আদালতের বিচারকগণ সময়ে সময়ে কারাগার পরিদর্শন করবেন এবং এটা নিশ্চিত করবেন যে হাজতী আসামিগণকে যেন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের হতে আলাদা রাখা হয়। মামলা ছাড়া কোন ব্যক্তি যেন হাজতে না থাকে এবং জামিন প্রাপ্ত আসামী বা কারাদণ্ড ভোগ শেষ হওয়ার পরে কেউ যেন কারাগারে অবস্থান না করে।

ষোড়শ অধ্যায়: বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি লাঘব

১.১ বিচারাঙ্গনে দুর্ভোগ ও হয়রানিজনিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের বিচারপ্রার্থী জনগণ আইন ও বিচারাঙ্গনে নানাভাবে দুর্ভোগ ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন। সেবা গ্রহণের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, মামলার কাজে দীর্ঘ সময় আদালতে অবস্থান করার ক্ষেত্রে কিংবা আইনজীবী ও আদালতের কর্মচারিদের সেবার মান বা আচরণ নিয়ে বেশির ভাগ মানুষের অভিজ্ঞতা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ নয়। কখনো বিচার ব্যবস্থার পদ্ধতিগত কারণে, কখনো আদালতের অব্যবস্থাপনার জন্য, কখনো বা আইনজীবী বা আইনজীবী সমিতির দ্বারা, কখনো বা আদালতের সহায়ক কর্মচারির কারণে বিচারপ্রার্থী মানুষ প্রতিনিয়ত দুর্ভোগ ও হয়রানির শিকার হচ্ছে। কমিশন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে একটি অনলাইন জরিপ পরিচালনা করে। উক্ত জরিপে হয়রানির বিষয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। আদালতের কার্যক্রম, আদালতের কর্মচারি এবং আইনজীবী সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে সেবাগ্রহীতাগণের সিংহভাগই নেতিবাচক উত্তর প্রদান করেছে। বিচার বিভাগের অংশীজনদের মতামত হতে এটি স্পষ্ট যে, আদালতসহ বিচারিক সেবার সাথে সংশ্লিষ্টদের বড় অংশের কার্যক্রম হয়রানিমূলক। নাগরিকদের বেশির ভাগই বিচার সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কারো সেবার মান নিয়ে সন্তুষ্ট নয়।

১.২ আদালত বা আদালতের ব্যবস্থাপনাজনিত ঘাটতির জন্য সৃষ্ট দুর্ভোগ

(ক) বিচারকের ছুটিজনিত কারণে দুর্ভোগ;
(খ) বিভিন্ন দিবস উদযাপন বা অনুষ্ঠান আয়োজনের কারণে সৃষ্ট দুর্ভোগ;
(গ) তদন্তাধীন ফৌজদারি মামলায় প্রকাশ্য আদালতে তারিখ না দেওয়ার কারণে দুর্ভোগ;
(ঘ) মাতৃদুগ্ধদানকারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় দুর্ভোগ;
(ঙ) মামলার তারিখ ও অন্যান্য তথ্য জানতে মানুষের দুর্ভোগ ও হয়রানি;
(চ) নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেজ বা গেটওয়ে সার্ভারে আদালতের সরাসরি এন্ট্রি না থাকার কারণে মামলার পক্ষ বা আসামীর পরিচয় যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা ও দুর্ভোগ;
(ছ) আদালতের উন্মুক্ত স্থানে মাদক পোড়ানোর কারণে অস্বস্তি ও দুর্ভোগ;
(জ) লিফটের অপর্যাপ্ততা ও অব্যবস্থাপনার কারণে ভোগান্তি
(ঝ) ডিসেম্বর মাসে আদালত বন্ধকালীন সময়ে দণ্ডিত আসামীর আত্মসমর্পণ বা গ্রেফতারকৃত আসামীর জামিন শুনানি জনিত জটিলতার কারণে দুর্ভোগ।

১.৩ আইনজীবী সমিতির মাধ্যমে সৃষ্ট হয়রানি

(ক) আইনজীবী সমিতি কর্তৃক আদালত বর্জন;
(খ) আইনজীবীর মৃত্যুতে আদালতের কার্যক্রম বন্ধ রেখে Death Reverence আয়োজন;
(গ) আইনজীবীদের ব্যক্তিগত মামলায় বার কর্তৃক বিপক্ষে আইনজীবী নিয়োগে বাধা প্রদান;
(ঘ) ক্লায়েন্ট আইনজীবী দ্বারা হয়রানির শিকার হলে তার প্রতিকার ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত ও দুর্বল।

১.৪ আইনজীবী কর্তৃক সৃষ্ট হয়রানি ও দুর্ভোগ

(ক) আদালত কর্তৃক প্রদত্ত 'খরচ' বা 'জরিমানার টাকা' সংশ্লিষ্ট পক্ষের পরিবর্তে আইনজীবী কর্তৃক গ্রহণ;
(খ) ক্লায়েন্টের ইচ্ছা অনুসারে আইনজীবী কর্তৃক মামলা ফেরৎ না দেয়া বা অনাপত্তি পত্র (NOC) ইস্যু না করা:

১.৫ সরকারি আইনজীবী কর্তৃক হয়রানি

(ক) মামলার সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অসহযোগিতা;
(খ) বাদী বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট অর্থ দাবি ইত্যাদি।

১.৬ আদালতের কর্মচারি কর্তৃক হয়রানি ও দুর্ভোগ

(ক) অসহযোগিতা, দুর্ব্যবহার ও অর্থ দাবি;
(খ) মামলার আদেশ, রায়, ডিক্রির নকল তুলতে হয়রানি।

২. হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা: অনলাইন জরিপে প্রাপ্ত মতামত

স্বচ্ছ, জনকল্যাণমুখী এবং হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা বাংলাদেশের বিচারপ্রার্থী জনগণের দীর্ঘলালিত আকাঙ্ক্ষা। কমিশন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে অনলাইন জরিপ পরিচালনা করেছে তার ফলাফলই মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। জরিপে সাধারণ নাগরিক, আইনজীবী, বিচারকের একটি বড় অংশ হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা চান মর্মে মতামত ব্যক্ত করেছে। উক্ত অনলাইন জরিপের মতামত হতে এটি স্পষ্ট যে, বিচার বিভাগের অংশীজন ও সেবাগ্রহীতাগণ হয়রানিমুক্ত বিচার চান। স্বচ্ছ, জনকল্যাণমূলক এবং হয়রানিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আদালতের ভিতরে এবং বাইরে বিচারিক সেবার যতগুলো ধাপ বা ক্ষেত্র আছে সবগুলোকে হয়রানিমুক্ত করার বহুমাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩. সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:

১. আদালত প্রাঙ্গণে রাজনৈতিক কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানাদি বন্ধ করতে হবে এবং বিচার বিভাগে বিভিন্ন দিবস উদযাপন বা অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের ক্ষেত্র সীমিত করার জন্য সার্কুলার জারি করতে হবে।

২. বিচারক ছুটিতে যাওয়ার বিষয়টি আগে থেকেই ওয়েবসাইট বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩. তদন্তাধীন ফৌজদারি মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বৃদ্ধি সংক্রান্ত দরখাস্তের ক্ষেত্রে বাদীর উপস্থিতিতে শুনানির মাধ্যমে আদেশ প্রদান করতে হবে।

৪. মামলার তারিখ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি জানার ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থী মানুষের হয়রানি ও দুর্ভোগ কমানোর জন্য অনলাইন ভিত্তিক ই-কজলিস্ট চালু করতে হবে।

৫. আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মামলার পক্ষগণের জাতীয় পরিচয় পত্র তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই বা সনাক্ত করার জন্য নির্বাচন কমিশনের গেটওয়ে সার্ভারে প্রবেশের ব্যবস্থা করার জন্য সুপ্রীম কোর্ট ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের উন্মুক্ত চত্বরে দিনের বেলায় মাদক পোড়ানো বন্ধ করে বিকল্প স্থান নির্ধারণ করতে হবে।

৭. আদালতের আদেশ দ্বারা প্রদত্ত 'খরচ' বা 'জরিমানার টাকা' আইনজীবীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক গ্রহণের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক একটি সার্কুলার জারি করতে হবে।

৮. মামলার আদেশ, রায়, ডিক্রীসহ অন্যান্য কাগজ পত্রের জাবেদা নকল প্রদানের ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে সরবরাহ পদ্ধতি সহজীকরণপূর্বক একটি সার্কুলার জারি করতে হবে।

৯. আদালত প্রাঙ্গণে শিশুদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং কক্ষ বা কর্নার স্থাপন করতে হবে এবং প্রতিবন্ধীদের চলাফেরার সুবিধার্থে লিফট ও আদালত কক্ষে অনুকূল ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১০. বহুতল বিশিষ্ট আদালত ভবনে পর্যাপ্ত লিফট এবং লিফটম্যানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. জেলা পর্যায়ে আদালত বর্জন কর্মসূচি বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং বার কাউন্সিলের কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। বার কাউন্সিলকে এই বিষয়ে একটি সার্কুলার জারি করতে হবে।

১২. প্রত্যেক আইনজীবীর মৃত্যুতে Death Reverence আয়োজনের পরিবর্তে বছরের নির্দিষ্ট একটি দিনে ঐ বছরে প্রয়াত সকল আইনজীবীর সম্মানার্থে Death Reverence অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক পুনরায় একটি সার্কুলার ইস্যু করা প্রয়োজন।

১৩. যেসব বারে আইনজীবীদের ব্যক্তিগত মামলায় বিপক্ষের হয়ে বারের কোনো সদস্য মামলা পরিচালনা করতে পারবে না মর্মে অলিখিত প্রচলন আছে সেসব বারের বিষয়ে বার কাউন্সিল কর্তৃক তদন্তপূর্বক দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪. আইনজীবীদের অসদাচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আনীত অভিযোগের তদন্ত, শুনানি ও নিষ্পত্তির বিষয়ে জেলা পর্যায়ে একটি প্রতিকার ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন।

১৫. ক্লায়েন্টের ইচ্ছা অনুসারে আইনজীবী কর্তৃক মামলা ফেরৎ না দেয়া বা NOC ইস্যু করার বিষয়ে বিড়ম্বনা দূরীকরণার্থে বার কাউন্সিল একটি নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

১৬. সরকারি আইনজীবীগণ কর্তৃক মামলায় গাফিলতি, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের সাথে অপেশাদার আচরণের বিষয়ে উত্থাপিত অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন করতে হবে।

সপ্তদশ অধ্যায়: বিচার বিভাগে দুর্নীতি প্রতিরোধ

১. ভূমিকা

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম মৌলিক শর্ত হলো আইন অনুযায়ী পরিচালিত একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর বিচার প্রক্রিয়ায় বিচার নিষ্পত্তি ও বিচার প্রার্থীকে প্রতিকার প্রদান। এই নীতির আবশ্যক অনুষঙ্গ হচ্ছে বিচার বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিগণ নিজেরা থাকবেন দুর্নীতিমুক্ত এবং সকল সন্দেহের উর্দ্ধে। তাদের কাজেও থাকতে হবে জবাবদিহিতা।

সংবিধান দেশে সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালত নামে দুই স্তরের বিচার প্রশাসন সৃষ্টি করেছে। সুপ্রীম কোর্টের দুই বিভাগে কর্মরত বিচারকগণের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল রয়েছে। অন্যদিকে সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করে থাকে হাইকোর্ট বিভাগ। তাই, বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল এবং হাইকোর্ট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিহীনতা।

৩. বিচারাঙ্গনে দুর্নীতি-অনিয়মের সম্ভাব্য কারণ:

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৮ কোটিরও বেশি। অথচ দেশে উচ্চ ও অধস্তন আদালত মিলিয়ে মোট বিচারকের সংখ্যা মাত্র ২,৩০০ এর কিছু বেশি। এই স্বল্প সংখ্যক বিচারকের মাধ্যমে জমে থাকা প্রায় ৪৩ লাখ মামলা নিষ্পত্তি করতে গিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হচ্ছে। আবার বিচার প্রক্রিয়ায় বিচারক ছাড়াও অপরিহার্য অংশীজন হচ্ছে আইনজীবী, পুলিশ, আইনজীবী সহকারি, আদালতের সহায়ক জনবল, তথা পেশকার, সেরেস্তাদার, জারিকারক ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ।

একজন বিচারপ্রার্থীকে উল্লিখিত ব্যক্তিদের সাথে মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে হয় এবং তাদের কারো কারো দ্বারা বিচার প্রার্থী জনগণ হয়রানির শিকার হন। হয়রানি এড়িয়ে সেবা লাভ করতে অনেকে বাধ্য হন ঘুষ বা অন্যবিধভাবে অর্থ প্রদান করতে। অনেকে আবার অবৈধ সুবিধা লাভ করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিকে ঘুষ প্রদান করে থাকেন। মোটা দাগে এগুলোই হচ্ছে বিচারাঙ্গনে দুর্নীতি-অনিয়মের মূল কারণ। এছাড়াও বিচারাঙ্গনে দুর্নীতি-অনিয়মের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা যায়। যথা:

- বিচার ও বিচার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে অংশ গ্রহণকারী বিচারক, আইনজীবী, আদালতের কর্মচারি, আইনজীবী সহকারি, পুলিশ বা তদন্তকারী কর্মকর্তা, প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের দায়িত্বশীলতার ঘাটতি;
- মামলার কজলিস্ট আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীর জন্য উন্মুক্ত রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারির দায়িত্বহীনতা;
- আদালত প্রাঙ্গণে তথ্য সেবা প্রদানের জন্য কোনো তথ্য কেন্দ্র না থাকা;
- সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক দৈনিক কর্মঘণ্টার সর্বোচ্চ ব্যবহার না করা;
- আদালতের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরে সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ না থাকা বা প্রদর্শন না করা;
- আইনজীবীদের মধ্যে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের উদ্যোগহীনতা;
- রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের তদারকি ব্যবস্থায় ঘাটতি;
- সংশ্লিষ্ট বিচারক বা অফিস প্রধান কর্তৃক অধীনস্ত কর্মচারিদের তদারকি ব্যবস্থায় ঘাটতি;
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বা অভিযোগ বক্সের অনুপস্থিতি।

৪. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক বিচারিক সেবা খাতে দুর্নীতির চিত্র:

২০২৩ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবি কর্তৃক প্রণীত দুর্নীতি বিষয়ক প্রতিবেদনে বিচারিক সেবা সংক্রান্ত দুর্নীতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে বিচারিক সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে বিচারপ্রার্থীগণ যে সকল দুর্নীতির শিকার হয়েছেন সেগুলো নিম্নরূপ:

(১)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া	৩৪.১ শতাংশ ক্ষেত্রে
(২)	অবহেলা	৩১.৫ শতাংশ ক্ষেত্রে
(৩)	হয়রানি	৩১ শতাংশ ক্ষেত্রে
(৪)	প্রতারণা	১৭.৫ শতাংশ ক্ষেত্রে
(৫)	স্বজন প্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার	১০ শতাংশ ক্ষেত্রে
(৬)	পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া	৭.৭ শতাংশ ক্ষেত্রে
(৭)	রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ	৬ শতাংশ ক্ষেত্রে

উক্ত প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে সেবা গ্রহীতাগণকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থ প্রদান করতে হয়েছে:

(১)	আইনজীবী সহকারি	৩৬.৩ শতাংশ ক্ষেত্রে
(২)	পেশকার	২৩.৭ শতাংশ ক্ষেত্রে
(৩)	নিয়োগকৃত আইনজীবী	২২.৪ শতাংশ ক্ষেত্রে
(৪)	দালাল	৪.৬ শতাংশ ক্ষেত্রে

বিচারিক সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে যারা ঘুষ দিয়েছেন তারা ঘুষ প্রদানের কারণ হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি উল্লেখ করেছেন:

(১)	ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না তাই তারা ঘুষ দিয়েছেন	৭৩.৯% ক্ষেত্রে
(২)	যথাসময়ে সেবা পেতে ঘুষ দিয়েছেন	২৮.৭% ক্ষেত্রে
(৩)	নির্ধারিত ফি বা তথ্য জানা না থাকায় ঘুষ দিয়েছেন	১৮.১% ক্ষেত্রে
(৪)	বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য ঘুষ দিয়েছেন	৪.৭% ক্ষেত্রে
(৫)	দ্রুত সেবা পাওয়ার জন্য ঘুষ দিয়েছেন	৭ % ক্ষেত্রে
(৬)	নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য ঘুষ দিয়েছেন	৬.৪ % ক্ষেত্রে
(৭)	সঠিক নথি উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে ঘুষ দিয়েছেন	৬ % ক্ষেত্রে
(৮)	নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা দ্রুত সেবা পেতে ঘুষ দিয়েছেন	৫.৪% ক্ষেত্রে

উল্লিখিত তালিকা হতে দেখা যায় বিচারিক সেবা পেতে যাদের ঘুষ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে বিচারকদের কথা উল্লেখ নেই। আবার বিচার প্রার্থীগণ যারা ঘুষ দিয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবৈধ সুবিধা লাভ করার উদ্দেশ্যে ঘুষ প্রদান করেছেন। সুতরাং যারা ঘুষ গ্রহণ করছে শুধু তাদের দায়ী করলে চলবে না, যারা ঘুষ প্রদান করেছে অবৈধ সুবিধা লাভের জন্য, তাদেরকেও আইনের আওতায় আনতে হবে।

প্রতিবেদনে যদিও বিচারকদের বিষয়ে কোনো কিছু বলা হয়নি। তবে বাস্তবতা এই যে, কিছু বিচারকের ঘুষ গ্রহণ বা অন্যবিধ সুবিধা আদায়ের বিষয় বা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, বিচার বিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে বিচারকদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনার সাথে সাথে বিচার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত অন্য সকল অংশীজনদেরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. সুপ্রীম কোর্টে দুর্নীতি প্রতিরোধ

সুপ্রীম কোর্টে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন:

(ক) সংবিধান অনুসারে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক সময়ে সময়ে অভিযোগ গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তি করাসহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ;

(খ) সুপ্রীম কোর্টের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের (প্রেষণে কর্মরত জুডিসিয়াল অফিসারগণসহ) বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য হাইকোর্ট বিভাগের তিনজন বিচারক সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে অভিযোগ গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তি করাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধে আনুষঙ্গিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

৬. অধস্তন আদালতে দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন

অধস্তন আদালতে দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে বিচারকদের সমন্বয়ে পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

জাতীয় পর্যায়ে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের সমন্বয়ে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রাথমিক তদন্ত কমিটি অধস্তন আদালতের বিচারকদের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন এবং অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবেন।

জেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তির জন্য একটি স্থানীয় কমিটি থাকবে যা, 'দুর্নীতি অনুসন্ধান ও প্রতিরোধ কমিটি' নামে অভিহিত হতে পারে।

প্রতিটি জজশীপে একজন অতিরিক্ত জেলাজজ, একজন যুগ্ম জেলা জজ এবং একজন সিনিয়র সহকারি জজের সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করতে হবে। একইভাবে প্রতিটি ম্যাজিস্ট্রেসিতে একজন এসিজেএম, একজন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং একজন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

উল্লিখিত দুর্নীতি অনুসন্ধান ও প্রতিরোধ কমিটিগুলেঅ অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তি করবেন।

৭. জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির কার্যপরিধি

১. অধস্তন আদালতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ;
২. আদালতের দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় নীতি, পদ্ধতি ও বিধি প্রণয়ন;
৩. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে সময়ে সময়ে সার্কুলার জারি করা;
৪. দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের কৌশল ও পরিকল্পনা নির্ধারণ এবং তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ;
৫. দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮. জেলা পর্যায়ে কমিটির কার্যপরিধি

১. জেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত অভিযোগ যাচাই-বাছাই ও অনুসন্ধান;
২. বিধি মোতাবেক অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ;
৩. জেলা আদালতের দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
৪. জাতীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
৫. আদালতের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৯. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System) চালু

বিভিন্ন সরকারি দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা দানের ক্ষেত্রে কোনো নাগরিক যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে তিনি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট যেকোনো অভিযোগ প্রদান করতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে সরকার অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ প্রণয়ন করেছে। সরকারি দপ্তরের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ভূক্তভোগী ব্যক্তি কিভাবে অভিযোগ দাখিল করবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কিভাবে অভিযোগ যাচাই-বাছাই, তদন্ত ও নিষ্পত্তি করবে তার একটি রূপরেখা উক্ত নির্দেশিকায় প্রদান করা হয়েছে। বিচার বিভাগের

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও স্পর্শকাতরতা বিবেচনায় অনুরূপ একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং তাঁর আলোকে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা চালু করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:**

বিচার বিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণ করা প্রয়োজন:

১. সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন সকল পর্যায়ের বিচারকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দুর্নীতি বিরোধী সুস্পষ্ট বিধানসম্বলিত আচরণবিধিমালা প্রণয়ন।

২. প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের বিচারকদের সম্পত্তির বিবরণ সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণ এবং তা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা।

৩. প্রতি তিন বছর পর পর সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সম্পত্তির বিবরণ সুপ্রীম কোর্টের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব সাইটে এবং অধস্তন আদালতের ক্ষেত্রে জেলা আদালতের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

৪. সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ লিখিতভাবে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের কাছে পৌছানোর জন্য সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ বাক্স স্থাপন এবং ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিলের জন্য ডেডিকেটেড ইমেইল এ্যাড্রেস জনসাধারণকে প্রদান করা।

৫. অধস্তন আদালতে কর্মরত বিচারকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রাথমিক তদন্ত কমিটি গঠন করা। তদন্ত কমিটি প্রতি ৩ মাস পর পর দাখিল হওয়া অভিযোগগুলো পরীক্ষা এবং অভিযুক্তের বক্তব্য শ্রবণপূর্বক তাতে প্রাথমিক সত্যতা আছে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অভিযুক্ত বিচারকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের বা অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করবেন।

৬. অনুচ্ছেদ (৪) এ উল্লিখিত তদন্ত কমিটিতে অভিযোগ জানানোর জন্য সুপ্রীম কোর্টে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন এবং একটি ডেডিকেটেড ইমেইল এড্রেস জনসাধারণকে প্রদান করা।

৭. অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিরীক্ষার জন্য জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত সকল অভিযোগ পর্যালোচনা করা এবং অভিযুক্ত কর্মকতা-কর্মচারির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা।

৮. অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দাখিলের জন্য প্রতিটি জজশিপ ও ম্যাজিস্ট্রেসিতে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা এবং ই-মেইলের মাধ্যমে দুর্নীতির শিকার ব্যক্তি যেন তাঁর অভিযোগ জানাতে পারে, সে জন্য জনসাধারণকে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে একটি ডেডিকেটেড ইমেইল এ্যাড্রেস (যা প্রতিটি জজশিপ ও ম্যাজিস্ট্রেসির জন্য আলাদা হবে) প্রদান করা।

৯. অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রতি ০৩ (তিন) মাস পর পর হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির নিকট তাদের কাজের বিবরণ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা।

১০. আইনজীবীগণের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জেলায় পৃথক পৃথক অভিযোগ গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তির জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা।

১১. বিচারাঙ্গণে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System) চালু করা।

অষ্টাদশ অধ্যায়: আইনগত সহায়তা কার্যক্রম

১. ভূমিকা

দারিদ্র বা আর্থিক অসচ্ছলতা হলো Access to Justice এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল দর্শন হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার। ধর্ম, বর্ণ কিংবা আর্থিক অসঙ্গতির কারণে কাউকে তার বিচারপ্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। সমাজের সকল মানুষের আর্থিক সঙ্গতি সমান থাকে না। ফলে দরিদ্র মানুষ আইনের আশ্রয় নিতে ব্যর্থ হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে নিঃস্ব ও অসহায় ব্যক্তিগণকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আইনগত সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৯(১) এর সমন্বিত পাঠ থেকে আইনগত সহায়তার বাধ্যবাধকতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

২. বর্তমান ব্যবস্থার সমস্যা

দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধিতে আইনগত সহায়তার বিধান থাকলেও শতাব্দীকাল আগে প্রণীত এসব বিধি-বিধান বর্তমানে প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়েছে। বর্তমান **সরকারি আইনি সেবা কার্যক্রমের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।**

(ক) আইনগত সহায়তার ধারণা সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ: আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এ 'আইনগত সহায়তা' শব্দটিকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। 'আইনগত সহায়তা'র এ সংজ্ঞায় এ্যাডভেলোরাম কোর্ট ফি, সব রকমের পত্রিকা বিজ্ঞপ্তি খরচ, ডিএনএ পরীক্ষার খরচ, সাক্ষী আনা নেওয়ার খরচ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে দরিদ্র জনগণ একদিকে মামলা মোকদ্দমার সকল স্তরে প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা পাচ্ছে না, অন্যদিকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু মামলা তারা সরকারি আইন সহায়তার আওতায় করতে পারছে না।

(খ) জাতীয় পরিচালনা বোর্ডসহ কমিটিগুলোর গঠন পূর্ণাঙ্গ নয়: আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর ধারা ৬ এর বিধান অনুযায়ী সংস্থার একটি জাতীয় পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। উক্ত পরিচালনা বোর্ডে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব নেই। বর্তমানে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসার এর পদ সৃজিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট লিগ্যাল এইড অফিসার সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড কার্যক্রমের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করছেন। এ কারণে সুপ্রীম কোর্ট কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসার-কে সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন। এছাড়া, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার এর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ থাকায় তাকে জেলা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

(গ) লিগ্যাল এইড অফিসারের ক্ষমতা সংক্রান্ত বিধানে অস্পষ্টতা: ***প্রথমত***, আদালত বা ট্রাইব্যুনাল লিগ্যাল এইড অফিসারের নিকট কিরূপ মামলা প্রেরণ করবে তৎসংক্রান্ত কোনো বিধান নেই; ***দ্বিতীয়ত***, লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক পরিচালিত মধ্যস্থতার কার্যপদ্ধতি আইনে বর্ণিত নেই; ***তৃতীয়ত***, লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক মধ্যস্থতার মাধ্যমে গৃহীত চুক্তি বলবৎকরণ সম্পর্কিত কোনো বিধান নেই।

(ঘ) আপীলের বর্তমান বিধান কঠিন: গরিব ও অসহায় জনগণের জন্য জাতীয় পরিচালনা বোর্ডে আবেদন করা খুবই কঠিন। আপীলের এরূপ বিধানটি আরো সহজতর হওয়া উচিত।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

(ক) সংস্থার কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা: বর্তমানে সংস্থার আর্থিক, প্রশাসনিক, প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের ব্যাপ্তি এত বিস্তৃত হয়েছে যে, সংস্থার মাধ্যমে এগুলো নিশ্চিত করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

(খ) অপর্যাপ্ত জনবল: বর্তমানে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মোট জনবলের সংখ্যা ৩২৮ জন। তন্মধ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের জনবল সংখ্যা ৩২ জন এবং সুপ্রীম কোর্ট ও জেলা লিগ্যাল এইড অফিস মিলে জনবল মোট সংখ্যা ২৯৬ জন। তাছাড়া সংস্থার অধীনে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কমিটি রয়েছে। প্রধান কার্যালয়ে এত স্বল্প সংখ্যক জনবল দিয়ে সুপ্রীমকোর্টসহ সারাদেশের এতগুলো জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সম্ভব নয়।

৪. কার্যকর ও মানসম্মত আইনি সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

(ক) অফিসার ও সহায়ক কর্মচারি সংকট: বর্তমানে প্রত্যেক জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে ১ জন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার, ১ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও ১ জন জারিকারকের পদ রয়েছে। এছাড়া ৩২ টি জেলায় বেঞ্চ সহকারির পদ থাকলেও অপর ৩২ টি জেলায় বেঞ্চ সহকারির কোনো পদ নেই। অধিকন্তু ইতিপূর্বে প্রত্যেক জেলায় ১ জন করে অফিস সহায়কের পদ থাকলেও উক্ত পদগুলো বিলুপ্ত করা হয়েছে। তীব্র জনবল সংকটে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

(খ) লিগ্যাল এইড অফিসের স্থান ও অবকাঠামো সংকট: বেশির ভাগ জেলা লিগ্যাল এইড অফিস নবনির্মিত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনে অবস্থিত। কিছু কিছু জেলায় চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মিত না হওয়ায় জেলা জজ আদালতের ছোট একটি কক্ষ থেকে এই অফিসের কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এতে বিচারপ্রার্থীদের বেশ অসুবিধা পোহাতে হচ্ছে। তদুপরি অধিকাংশ লিগ্যাল এইড অফিসে পৃথক কোনো মেডিয়েশন চেম্বার নেই। মীমাংসা কার্যক্রমের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে আদর্শ মেডিয়েশন চেম্বারের বিকল্প নেই। একাধিক লিগ্যাল এইড অফিসারের দপ্তরসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক মেডিয়েশন চেম্বার এবং সেবাগ্রহীতা নারী, শিশু ও বয়স্ক মানুষের উপযোগী কক্ষসমৃদ্ধ লিগ্যাল এইড অফিস নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

(গ) প্যানেল আইনজীবীদের ফি অপর্যাপ্ত: সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় সংস্থার প্যানেল আইনজীবীগণ বিভিন্ন আদালতে গরিব বিচারপ্রার্থীগণের পক্ষে মামলা পরিচালনা করে থাকেন। কিন্তু বিদ্যমান ফি এতই অপ্রতুল যে পেশাদার, অভিজ্ঞ ও মানসম্পন্ন আইনজীবীগণের অনেকে লিগ্যাল এইডের মামলা পরিচালনা করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। আবার অনেক আইনজীবী লিগ্যাল এইডের মামলা পরিচালনা করলেও বিদ্যমান ফি'র অপ্রতুলতার কারণে গুরুত্বের সাথে মামলায় পদক্ষেপ নেন না বা আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন না। এতে আইন সহায়তা গ্রহীতাগণ ক্ষতির সম্মুখীন হন এবং মানসম্মত আইনি সেবা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়।

৫. লিগ্যাল এইড অফিস: এডিআর বাস্তবায়নে নব দিগন্ত

বিদ্যমান অবস্থায় লিগ্যাল এইড অফিসকে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কেন্দ্রস্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫.১ প্রস্তাবিত অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

সুপ্রীম কোর্টসহ দেশের মাঠ পর্যায়ে অধিদপ্তরের আওতায় ৪ ধরণের লিগ্যাল এইড এন্ড মেডিয়েশন অফিস থাকবে: সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড এন্ড মেডিয়েশন অফিস, জেলা লিগ্যাল এইড এন্ড মেডিয়েশন অফিস, শ্রম আদালত লিগ্যাল এইড এন্ড মেডিয়েশন অফিস এবং চৌকি/উপজেলা আদালত লিগ্যাল এইড এন্ড মেডিয়েশন অফিস।
অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ৭টি দপ্তর থাকবে: ১. মহাপরিচালকের দপ্তর ২. পরিচালকদের দপ্তর, ৩. পরিচালক (প্রশাসন) এর আওতাধীন দপ্তর ৪. পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা) এর আওতাধীন দপ্তর ৫. পরিচালক (মনিটরিং) এর আওতাধীন দপ্তর ৬. পরিচালক (প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ) এর আওতাধীন দপ্তর এবং ৭. পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর আওতাধীন দপ্তর। মহাপরিচালক, পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং সহকারি পরিচালকদের প্রত্যেকটি দপ্তরে প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো স্থির করে উক্ত পদগুলো সৃষ্টি করতে হবে।

৫.২ সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো

সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য ১৫ জনের জনবল কাঠামো সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে। উক্ত জনবল কাঠামোতে অতিরিক্ত জেলা জজ পদমর্যাদার ১ জন প্রধান লিগ্যাল এইড অফিসার, যুগ্ম জেলা জজ পদমর্যাদার ১ জন লিগ্যাল এইড অফিসার, সিনিয়র সহকারি জজ পদমর্যাদার ১ জন লিগ্যাল এইড অফিসার, ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ৩ জন কোর্ট এসিস্ট্যান্ট, ১ জন রেকর্ড কিপার, ১ জন হিসবারক্ষক, ৩ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ২ জন অফিস সহায়ক ও ১ জন পরিচ্ছন্নকর্মীর পদ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬. জেলা লিগ্যাল এইড এন্ড মেডিয়েশন অফিসের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো

বিভাগীয় শহর সম্বলিত জেলার ক্ষেত্রে
দেশের ৮টি বিভাগীয় শহর সম্বলিত জেলায় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ) ৪ জন করে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার থাকবে, যাদের পদবী ও কার্যক্রম হবে নিম্নরূপ:

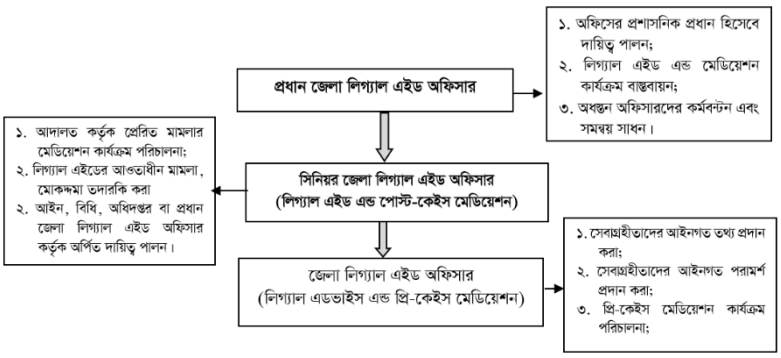

অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে
বিভাগীয় শহর সম্বলিত জেলা বাদে দেশের অন্যান্য জেলায় ৩ জন করে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার থাকবে, যাদের পদবি ও কার্যক্রম হবে নিম্নরূপ:

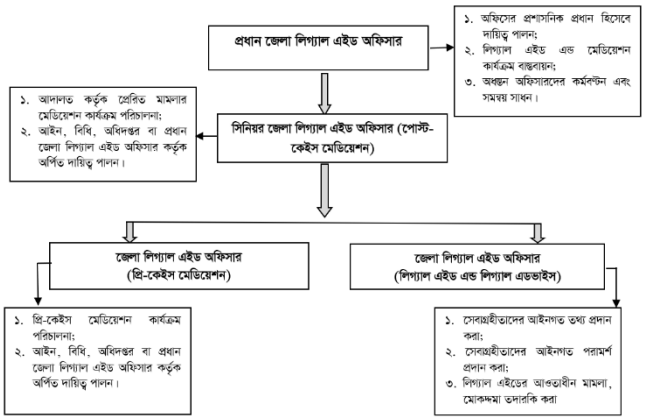

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে উল্লিখিত ৮টি জেলার প্রত্যেকটিতে ৪ জন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার (যুগ্ম জেলা জজ পদমর্যাদার ১ জন প্রধান জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার, সিনিয়র

সহকারি জজ পদমর্যাদার ১ জন সিনিয়র জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার এবং সহকারি/সিনিয়র সহকারি জজ পদমর্যাদার ২জন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার) এবং অবশিষ্ট ৫৬টি জেলার প্রত্যেকটি ৩জন করে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের পদসহ ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ৩ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ১ জন হিসাবরক্ষক, ৩ জন বেঞ্চ সহকারি, ১ জন সার্ভেয়ার, ২ জন জারিকারক, ৩ জন অফিস সহায়ক ও ১ জন পরিচ্ছন্নকর্মীর পদ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:**

১. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার বিদ্যমান সেবার পরিধি বৃদ্ধি করে আইনগত সহায়তার পাশাপাশি মীমাংসা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্র সৃষ্টি করে মেডিয়েশন কার্যক্রমকে সমগ্র বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিককরণের লক্ষ্যে সংস্থাকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তর করতে হবে।

২. আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ রহিতক্রমে আইনগত সহায়তার পাশাপাশি মেডিয়েশন বা মধ্যস্থতার বিধান সম্বলিত একটি সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক। আইনগত সহায়তা ও মেডিয়েশনের বিধান সন্নিবেশিত করে আইনের একটি খসড়া পরিশিষ্ট ৫ এ সংযোজন করা হয়েছে।

৩. জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে বিভাগীয় শহর সম্বলিত জেলায় ৪ জন এবং অন্যান্য জেলায় ৩ জন লিগ্যাল এইড অফিসার (যুগ্ম জেলা জজ পদমর্যাদার ১ জন প্রধান লিগ্যাল এইড অফিসার, সিনিয়ন সহকারি জজ পদমর্যাদার ১ জন সিনিয়র লিগ্যাল এইড অফিসার এবং সহকারি/সিনিয়র সহকারি জজ পদমর্যাদার ১ জন লিগ্যাল এইড অফিসার), ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ৩ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ১ জন হিসাবরক্ষক, ৩ জন বেঞ্চ সহকারি, ১ জন সার্ভেয়ার, ২ জন জারিকারক, ৩ জন অফিস সহায়ক ও ১ জন পরিচ্ছন্নকর্মীর পদ সৃজন করা প্রয়োজন।

৪. শ্রম আদালত লিগ্যাল এইড অফিস এবং চৌকি/উপজেলা আদালত লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য ৪ জনের জনবল কাঠামো সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে। উক্ত জনবল কাঠামোতে সিনিয়র সহকারি জজ/সহকারি জজ পদমর্যাদার ১ জন লিগ্যাল এইড অফিসার, ১ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ১ জন অফিস সহায়ক ও ১ জন পরিচ্ছন্নকর্মীর পদ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫. প্রস্তাবিত অধিদপ্তরের কার্যালয় নিজস্ব ভবনে স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস, জেলা লিগ্যাল এইড অফিস, শ্রম আদালত লিগ্যাল এইড অফিস এবং চৌকি আদালত লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য পৃথক ভবন বা সুপ্রশস্ত অফিস কক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেকটি লিগ্যাল এইড অফিসে পর্যাপ্ত সংখ্যক অফিস কক্ষ, ক্লায়েন্ট চেম্বার, মেডিয়েশন চেম্বার স্থাপন করতে হবে। উক্ত অফিসগুলোতে সভাকক্ষ, পাঠাগার, ব্রেস্ট ফিডিং রুমসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. আইনগত পরামর্শ প্রদান, মীমাংসা বা মধ্যস্থতা কার্যক্রম পরিচালনা, মধ্যস্থতা কৌশল, ক্লায়েন্ট কাউন্সেলিং ইত্যাদি বিষয়ে লিগ্যাল এইড অফিসারকে দেশে বিদেশে ব্যাপকভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৭. লিগ্যাল এইড অফিসের আইনি সেবা এবং মীমাংসা ও মধ্যস্থতা সেবা সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা তৈরির জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ নিতে হবে।

ঊনবিংশ অধ্যায়: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

১. ভূমিকা

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) ব্যবস্থাকে বিস্তৃতভাবে প্রয়োগ করে বিশ্বের বহু দেশ তাদের মামলাজট নিয়ন্ত্রণসহ সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের তিন-চতুর্থাংশ ফেডারেল কোর্ট কোনো না কোনো পদ্ধতির এডিআর ব্যবস্থা অনুসরণ করে। যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও সিঙ্গাপুরসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশে এখনই এডিআর ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান এটি স্পষ্ট যে, প্রচলিত আদালত পদ্ধতির মাধ্যমে এডিআর কার্যক্রম খুব একটা সফল হয়নি। তবে, লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে সীমিত আকারে গৃহীত উদ্যোগের সাফল্য সন্তোষজনক। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, মামলা ও বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যকর ও টেকসই সমাধান, দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস এবং সর্বোপরি সামাজিক সৌহার্দ, সম্প্রীতি রক্ষায় দেশে একটি শক্তিশালী এডিআর ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই।

২. বাংলাদেশে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বাস্তবায়নে সমস্যা: এটি সত্য যে, এডিআর বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষে বাংলাদেশে বেশ কিছু আইনে পদ্ধতিগত বিধানাবলি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কিন্তু এটি মোটেও যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশের বাস্তবতায় এটি পরিষ্কার যে, কেবল আইন প্রণয়ন বা আইনি সংস্কার করে সামাজিকভাবে কোনো বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এডিআর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিরাজমান মৌলিক সমস্যাগুলো নিম্নরূপ:

- এডিআর বা মধ্যস্থতা বিষয়ক পৃথক কোনো আইন নেই;
- এডিআর বা মধ্যস্থতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়ন এবং প্রচার-প্রসারের জন্য সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান নেই;
- আদালত ব্যতীত এডিআর বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির স্বীকৃত কোনো আইনি কাঠামো নেই;
- দেশে প্রশিক্ষিত মধ্যস্থতাকারীর অভাব;
- মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আইনজীবীগণের প্রতি মামলার পক্ষগণের আস্থার অভাব;
- মধ্যস্থতা কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতিগত বিষয়াবলি সম্বলিত কোনো বিধিমালা নেই;
- এডিআর এর মাধ্যমে সফল মামলা নিষ্পত্তি সত্ত্বেও বিচারকদের কৃতিত্ব যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় না;
- মধ্যস্থতাকারীর ফি পরিশোধের বিষয়ে কোনো নীতিমালা বা নির্দেশনা নেই;
- মধ্যস্থতার জন্য অফিস, জনবল ও সরঞ্জামাদিসহ ভৌত অবকাঠামো সুবিধা সম্বলিত কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নেই।

৩. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বাস্তবায়নের রোডম্যাপ

৩.১ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন: বিকল্প বিরোধ পদ্ধতির মাধ্যমে মামলা বা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশে চার ধরনের পদ্ধতি থাকলেও বেশির ভাগ দেওয়ানি ও পারিবারিক আইনে মধ্যস্থতার বিধান সন্নিবেশিত আছে। তাছাড়া বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ। বর্তমানে মধ্যস্থতা সংক্রান্ত কোনো আইন না থাকার ফলে নিম্নরূপ সমস্যা দেখা দিচ্ছে:

- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা যাচ্ছেনা;
- পেশাদার মধ্যস্থতাকারী সৃষ্টি হচ্ছেনা;
- সব রকমের মধ্যস্থতা চুক্তি আইনি প্রক্রিয়ায় বলবৎ করা যাচ্ছেনা;

- মধ্যস্থতার বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা যাচ্ছেনা।

সামগ্রিক বিবেচনায়, উল্লিখিত সমস্যাসমূহ দূরীভূত করে বাংলাদেশে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য মধ্যস্থতা (Mediation) বিষয়ক একটি আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক।

৩.২ প্রস্তাবিত আইনের বিষয়বস্তু

১. সুপ্রীম কোর্ট, জেলা আদালত, শ্রম আদালত ও চৌকি আদালত এবং প্রস্তাবিত উপজেলা আদালতে কার্যকর আইনি সেবা নিশ্চিতকরণ;
২. আইনগত সহায়তার ক্ষেত্র ও পরিধি বৃদ্ধি;
৩. লিগ্যাল এইড অফিসারকে আইনগত পরামর্শ এবং মধ্যস্থতার (Pre-case এবং Post-case mediation) মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা প্রদান;
৪. Pre-case এবং Post-case mediation এর পদ্ধতি নির্ধারণ;
৫. বিদ্যমান জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণ;
৬. মধ্যস্থতা কার্যক্রমের প্রচার, প্রসার ও সহজীকরণ;
৭. মধ্যস্থতার মাধ্যমে গৃহীত চুক্তি বলবৎকরণ;
৮. পেশাদার মধ্যস্থতাকারী সৃষ্টি এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
৯.মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারীগণকে সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য 'অ্যাক্রেডেটিশন কমিটি' গঠন;
১০. মধ্যস্থতাকারীকে সার্টিফিকেট বা স্বীকৃতি (Accreditation) প্রদান;
১১. মধ্যস্থতা কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ;
১২. মধ্যস্থতার জন্য মামলা প্রেরণের বিষয়ে আদালত ও ট্রাইব্যুনালকে ক্ষমতা প্রদান;
১৩. মধ্যস্থতার জন্য উপযুক্ত বিরোধ বা মামলার তপশিল অন্তর্ভুক্তি;
১৪. মধ্যস্থতার কার্যপ্রণালী নির্ধারণ;
১৫. জেলা ভিত্তিক মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারী প্যানেল তৈরির পদ্ধতি নির্ধারণ;
১৬. মধ্যস্থতাযোগ্য মামলাসমূহ চিহ্নিতকরণ;
১৭. মধ্যস্থতাকারীর সম্মানী নির্ধারণের বিধান;
১৮. মধ্যস্থতা কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি।

৩.৩ প্রস্তাবিত আইনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

৩.৩.১ কারা মধ্যস্থতাকারী (Mediator) হবেন

- মামলা পূর্ব ও মামলা পরবর্তী মধ্যস্থতার (Both pre-case and post case mediation) ক্ষেত্রে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার।
- মামলা পরবর্তী মধ্যস্থতার (Post-case mediation) ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত আইনের আওতায় লাইসেন্স/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত (Accredited) মধ্যস্থতাকারীগণ।

৩.৩.২ প্রস্তাবিত আইনে কি ধরণের মধ্যস্থতা সন্নিবেশিত হবে

মামলা পরবর্তী মধ্যস্থতা (Post-Case Mediation)

- বর্তমানে মধ্যস্থতা সংক্রান্ত বিদ্যমান বিভিন্ন আইনের বিধান যেমন: দেওয়ানি কার্যবিধি আইনের ৮৯এ ধারা, অর্থঋণ আদালত আইনের ২২, ২৩, ২৪, ২৫ ও ৩৮ ধারা, পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ এর ১১ ও ১৪ ধারাসহ অন্যান্য আইনে মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির যে সব বিধান রয়েছে এগুলো কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে নিষ্পত্তিকরণ।

- আইনের তফসিলে মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য একটি দেওয়ানি মামলার তালিকা (List of civil cases fit for mediation) এবং একটি আপোশযোগ্য ফৌজদারি মামলার তালিকা প্রদান।

মামলা পূর্ব মধ্যস্থতা (Pre-Case Mediation)

লিগ্যাল এইড অফিসারগণ কর্তৃক মামলা পূর্ব মধ্যস্থতার (Pre-Case) মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত বিরোধের মীমাংসা চুক্তি বলবৎকরণের পদ্ধতি প্রস্তাবিত আইনে সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন।

৩.৩.৩ মধ্যস্থতাযোগ্য মামলা প্রেরণের বিষয়ে আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা সম্বলিত বিধান

প্রস্তাবিত আইনের তফসিলে যেসব দেওয়ানি ও পারিবারিক মামলা এবং আপোশযোগ্য ফৌজদারি মামলা সন্নিবেশিত করা হবে সংশ্লিষ্ট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল মামলার যে কোনো পর্যায়ে মধ্যস্থতার জন্য মধ্যস্থতাকারীগণের নিকট অনুরূপ মামলা প্রেরণ করতে পারবে মর্মে বিধান সন্নিবেশিতকরণ।

৩.৩.৪ মধ্যস্থতা চুক্তি বলবৎকরণের বিধান

মধ্যস্থতার মাধ্যমে তৈরিকৃত, পক্ষগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক প্রত্যয়িত (Authenticated) মীমাংসা চুক্তি চূড়ান্ত এবং পক্ষগণের উপর বাধ্যকর মর্মে গণ্য হবে। এছাড়া চুক্তির যে কোনো পক্ষের আবেদনক্রমে মীমাংসা চুক্তিটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য হবে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে সম্পাদিত সকল চুক্তি দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর বিধান অনুসারে এরূপভাবে বলবৎযোগ্য হবে যেন এটি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি বা রায়। এই উদ্দেশ্যে:

- মামলা পরবর্তী মধ্যস্থতার (Post-Case Mediation) ক্ষেত্রে যে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল থেকে মামলাটি প্রেরিত হয়েছে মধ্যস্থতা পরবর্তী কার্যক্রম বা বলবৎকরণের জন্য এটি সংশ্লিষ্ট আদালত বা ট্রাইব্যুনালে প্রেরিত হবে;
- মামলা পূর্ববর্তী মধ্যস্থতার (Pre-Case Mediation) ক্ষেত্রে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মীমাংসা চুক্তির বিষয়বস্তু যে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারাধীন সে আদালত বা ট্রাইব্যুনালে জারি মামলা দায়েরের মাধ্যমে উক্ত চুক্তিটি বলবৎযোগ্য করা যাবে।

৩.৩.৫ মধ্যস্থতা চুক্তির চ্যালেঞ্জ বা এর বিরুদ্ধে আপীল দায়ের

মধ্যস্থতা চুক্তিটি সাধারণভাবে আপীল বা চ্যালেঞ্জযোগ্য নয়। তবে মধ্যস্থতা চুক্তিটি প্রতারণা (Fraud), দুর্নীতি (Corruption), মিথ্যা বা ভুয়া পরিচয়দানের (Impersonation) মাধ্যমে সম্পাদিত হলে এবং প্রস্তাবিত আইনে বর্ণিত মধ্যস্থতাযোগ্য মামলা ব্যতিরেকে অন্যান্য মামলায় মধ্যস্থতা চুক্তি হলেই কেবল এটি চ্যালেঞ্জ করা যাবে।

৩.৩.৬ মধ্যস্থতা কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

মধ্যস্থতাকারী লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট (Accreditation) প্রদান, নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে লাইসেন্স নবায়ন, মধ্যস্থতাকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, মধ্যস্থতা কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতিমালা ও কার্যপ্রণালী প্রণয়ন, মধ্যস্থতা কার্যক্রমের প্রচার ও প্রসার, মধ্যস্থতাকারীদের মানোন্নয়ন ও শৃঙ্খলা বিধানসহ তাদের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির সামগ্রিক দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে প্রস্তাবিত অধিদপ্তরের উপর। মেডিয়েটরগণকে অ্যাক্রেডিটশন সার্টিফিকেট প্রদান বা তালিকাভুক্তির জন্য 'অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি' নামে একটি কমিটি থাকবে, যা নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হবে:

(ক) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সভাপতি;
(খ) রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট- সদস্য;
(গ) সচিব, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল- সদস্য;
(ঘ) বাংলাদেশ পুলিশ এর মহা-পরিদর্শক কর্তৃক মনোনীত ডিআইজি পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা- সদস্য;
(ঙ) মহা-পরিচালক, লিগ্যাল এইড এন্ড মেডিয়েশন সার্ভিসেস অধিদপ্তর- সদস্য সচিব।

৩.৩.৭ মধ্যস্থতাযোগ্য মামলার তফসিল (Schedule of Cases Fit for Mediation)

৩.৩.৭.১ দেওয়ানি প্রকৃতির মামলা ও বিরোধ

১. দেওয়ানি প্রকৃতির যে কোনো মোকদ্দমা বা বিরোধ;
২. চুক্তি সংক্রান্ত যে কোনো মোকদ্দমা বা বিরোধ;
৩. বাণিজ্যিক লেনদেন হতে সৃষ্ট যে কোনো মোকদ্দমা বা বিরোধ;
৪. পারিবারিক আদালত আইন ২০২৩ এর অধীন পারিবারিক মোকদ্দমাসমূহ;
৫. বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১ এর অধীন মোকদ্দমাসমূহ;
৬. জমিজমা সংক্রান্ত বণ্টন মোকদ্দমাসমূহ;
৭. The State Acquisition & Tenancy Act,1950 এর ধারা ৯৬ এর অধীন অগ্রক্রয়ের দরখাস্তসমূহ;
৮. Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 এর ধারা ২৪ এর অধীন অগ্রক্রয়ের দরখাস্তসমূহ;
৯. মুসলিম শরীয়া আইনের অধীন অগ্রক্রয়ের মোকদ্দমাসমূহ;
১০. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ এর ধারা ৯, ১২, ১৩, ২১, ২১ক, ২২ ও ২৩ এর অধীন মোকদ্দমাসমূহ;
১১. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২১০ এর অধীন উত্থিত শিল্প বিরোধসমূহ;
১২. পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮ অনুসারে পিতা-মাতার ভরণপোষণ সংক্রান্ত দাবি;
১৩. ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইন ২০১০ এর ধারা ৩৯ অনুযায়ী শিল্প বিরোধ এবং ধারা ৪৩ অনুযায়ী ধর্মঘট বা লক আউট;
১৪. অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ ও ২৩ অনুসারে অর্থঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবিসমূহ;
১৫. দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ এর ধারা ৪৩ অনুযায়ী দেনাদার ও দেনার দায় মেটানো সংক্রান্ত বিষয়াদি।

৩.৩.৭.২ ফৌজদারি মামলা ও বিরোধ

১. The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ধারা ৩৪৫ এর অধীন আপোশযোগ্য ফৌজদারি অপরাধসমূহ;
২. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এর অধীন পারিবারিক সহিংসতা সংক্রান্ত অপরাধসমূহ
৩. রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর অধীন দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ
৪. নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর অধীন ধারা ৩২, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ ও ৪২ এর অপরাধসমূহ
৫. বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৭ এবং ৪০ এর অধীন অপরাধসমূহ
৬. সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা ৬৬, ৭২, ৭৫, ৮৭, ৮৯ ও ৯২ এর অধীন অপরাধসমূহ
৭. ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭, ৯, ১০ ও ১৩ এর অধীন অপরাধসমূহ

৪. ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে আপোশের পরিধি বিস্তৃতি: বর্তমানে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪৫ ধারা মোতাবেক কিছু অপরাধ আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে এবং কিছু অপরাধ আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে আপোশের সুযোগ থাকলেও আদালত কর্তৃক স্বপ্রণোদিত হয়ে আপোশের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আইনি কোনো বিধান নেই। বিদ্যমান অবস্থায় গুরুতর প্রকৃতির নয় এরূপ ফৌজদারি অপরাধের বিষয়ে পক্ষদের নিজস্ব উদ্যোগের পাশাপাশি মধ্যস্থতার মাধ্যমে আপোশের সুযোগ সৃষ্টির জন্য দুটি বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে। প্রথমতঃ বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও আদালতে অত্যধিক মামলার চাপ বিবেচনায় নিয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪৫ ধারায় উল্লিখিত আপোশযোগ্য মামলার পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আদালত স্ব-উদ্যোগে অথবা পক্ষগণের আবেদনের ভিত্তিতে মামলার বিরোধীয় বিষয়টি মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য মধ্যস্থতাকারীর নিকট প্রেরণের বিধান ফৌজদারি কার্যবিধিতে সন্নিবেশিত করতে হবে।

৫. সালিস আইন, ২০০১ এর সংশোধন

সালিসের সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে অনেক বছর ধরেই সালিস আইন ২০০১-এর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। ২০২১ সালের ৩০ ডিসেম্বর আইন কমিশন "সালিশ আইন, ২০০১ এর প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ খসড়া ও সুপারিশ" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এর পর তিন বছর সময় অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত সংশোধনীগুলোকে আইনে সন্নিবেশিত করার লক্ষ্যে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

সালিস আইনের ৫৭ ধারায় এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধিমালা প্রণয়নের বিধান থাকলেও আজ পর্যন্ত সরকার এব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা যায়নি। এমতাবস্থায়, সালিস আইন, ২০০১ সংশোধন করা ও বিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপঃ**

১. আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ রহিতক্রমে আইনগত সহায়তা ও মেডিয়েশনের বিধান সম্বলিত আইনগত সহায়তা ও মধ্যস্থতা সেবা প্রদান অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণয়ন করতে হবে যার খসড়া পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট ৫ এ সন্নিবেশিত হয়েছে।

২. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার বিদ্যমান সেবা কাজের পরিধি কৃদ্ধি করে আইনগত সহায়তার পাশাপাশি মীমাংসা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্র সৃষ্টি করে মেডিয়েশন কার্যক্রমকে সমগ্র বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিককরণের জন্য সংস্থাকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তর করতে হবে।

৩. মামলা পূর্ব মধ্যস্থতা (Pre-Case Mediation) ও মামলা পরবর্তী মধ্যস্থতা (Post-Case Mediation) এর ক্ষেত্রে পরিচালনার কার্যপ্রণালীসহ অন্যান্য পদ্ধতিগত বিষয় নির্ধারণের জন্য একটি বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৪. মধ্যস্থতাকারীদের ফি পরিশোধের বিধান ও নিয়মাবলি সম্বলিত নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৫. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ও মধ্যস্থতার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে হবে। মেডিয়েশনের সুবিধা সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা, জনমত গঠন, সভা-সেমিনার, পোস্টার, লিফলেট এবং টিভিসি নির্মাণপূর্বক প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

৬. জেলা লিগ্যাল এইড অফিসকে মধ্যস্থতার 'কেন্দ্রস্থল' হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা কৃদ্ধি করতে হবে।

৭. অবিলম্বে বাংলাদেশ আইন কমিশনের প্রস্তাবিত সালিস আইনের সংশোধনীগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য অংশীজনদের সাথে আলোচনাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন;

৮. সালিসের মূল ধারণা এবং সালিস আইন, ২০০১ এর সাথে সাংঘর্ষিক আইন ও বিধানগুলোকে সংশোধন করা প্রয়োজন যাতে বাণিজ্যিক সালিসের সুযোগ সংকুচিত না হয়;

৯. সালিস আইন, ২০০১-এর অধীনে পরিচালিত সালিসের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্য-পদ্ধতি নির্ধারণ করে বিধিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক।

১০. ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪৫ ধারা সংশোধন করতঃ আপোশ /বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্র বৃদ্ধি করতে হবে।

বিংশ অধ্যায়: মামলাজট হ্রাস

১. নিষ্পন্নাধীন ৪৩ লক্ষ মামলার জট

সুপ্রীম কোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিচারাধীন মোট মামলার সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:

(ক) আপীল বিভাগে মোট ২৬,৫১৭ টি

(খ) হাইকোর্ট বিভাগে মোট ৫,৪৩,৮৪৭টি; এবং

(গ) জেলা পর্যায়ের আদালতে মোট ৩৭,২৯,২৩৫টি

অর্থাৎ সর্বমোট ৪২,৯৯,৫৯৯ টি মামলা বিচারাধীন।

আপীল ও হাইকোর্ট বিভাগে মামলা ও বিচারকের সংখ্যার এই তুলনামূলক পরিসংখ্যানটি প্রণিধানযোগ্য

সাল	আপীল ও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা	বিচারকের সংখ্যা	বিচারক প্রতি মামলার সংখ্যা
১৯৭৫	৩৩,৬৫৭	১৭ জন	১,৯৭৯.৮২ টি
২০২৩	৫,৭০,৩৬৪	১০০ জন	৫,৭০৩. ৬৪ টি

অধস্তন আদালতে মামলা ও বিচারকের সংখ্যার পরিসংখ্যান

সাল	বিচারাধীন মামলার সংখ্যা	বিচারকের সংখ্যা	বিচারক প্রতি মামলার সংখ্যা
২০০৮	১৪,৮৯,১২১	৭৫২ জন	১,৯৮০.২১
২০২৩	৩৭,২৯,২৩৫	২,০০৩ জন	১,৮৬১.৮২

২০২৩ সালে অধস্তন আদালতে দায়েরকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান:

দায়ের	নিষ্পত্তি	২০২৩ সালে দায়েরের তুলনায় কম নিষ্পত্তির সংখ্যা	২০২৩ সাল শেষে মোট বিচারাধীন
১৪,২৯,১৮৫	১৩,৩৭,১২৩	৯২,০৬২	৩৭,২৯,২৩৫

উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মামলা ও জনসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশে বিচারকের সংখ্যা কমপক্ষে দুইগুণ বৃদ্ধি না করলে অর্থাৎ অধস্তন আদালতে কর্মরত মোট বিচারকের সংখ্যা কমপক্ষে ৬০০০ এ উন্নীত না করলে মামলাজট কে সহনীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব নয়। কিন্তু, একসঙ্গে অতিরিক্ত ৪০০০ বিচারক নিয়োগ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং নতুন নিয়োগে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিচারক পাওয়াও সম্ভব নয়। তাই ধাপে ধাপে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এরূপ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতি এক হাজার মামলার জন্য ১ (এক) জন বিচারক এই অনুপাতটি অনুসরণ করতে হবে। বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, জনবল এবং লজিস্টিক সাপোর্ট এর ব্যবস্থা করতে হবে।

২. অধস্তন /নিম্ন আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহের ধরন

জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের বিচারাধীন দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় প্রকার মামলা প্রধানত দুই ধরনের। যথা: (ক) মূল মামলা এবং (খ) আপীল/রিভিশন মামলা। আবার এসব মামলার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তিতে সাধারণত বেশি সময় প্রয়োজন হয় মূল মামলায়। দ্বিতীয় স্তরের মামলায় অর্থাৎ আপীল/ রিভিশন মামলায় অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগলেও এসব মামলার নিষ্পত্তি বিলম্বিত হয় বেশি। কেননা, এসব মামলায় সাধারণত নিম্ন আদালতের নথিতে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি থাকে। তাছাড়া কোনো কোনো মামলায় থাকে আইনগত জটিলতা বিষয়ক সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা। দেওয়ানি বা ফৌজদারি আপীল বা রিভিশন মামলার যে কোনো এক ধরনের মামলা ১০০০টির বেশি বিচারাধীন আছে এমন জেলা আদালতগুলোতে মামলাজট নিরসনের জন্য ক্রাশ প্রোগ্রাম নেওয়া যেতে পারে।

৪. মামলা জট নিরসনে বিশেষ আদালত আইন, ২০০৩ এর অপর্যাপ্ততা

আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় বিশেষ বিশেষ আদালত তৈরি করা হয়েছে। যেমন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, দুর্নীতি বিষয়ক বিশেষ জজ আদালত, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, শিশু আদালত, ইত্যাদি। আবার বিভিন্ন জেলায় এই সব বিশেষ আদালতে দায়েরকৃত/নিষ্পন্নাধীন মামলার সংখ্যা বিভিন্ন রকম। সেই কারণে বিশেষ আদালত আইন, ২০০৩ এ এই মর্মে বিধান করা হয় যে, জেলার জেলা ও দায়রা জজ তাঁর নিজস্ব বা অধীনস্ত অন্যান্য আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ ঐ জেলার বিশেষ আদালতে বদলি করতে পারবেন।

কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট থেকে প্রাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত নিষ্পত্তি বিষয়ক তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, বিশেষ আদালত আইনের অধীনে প্রায় সব জেলাতেই বিশেষায়িত আদালত/ট্রাইব্যুনালগুলোকে (নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ছাড়া) জেলা ও দায়রা জজ আদালত হতে বিভিন্ন পর্যায়ের মামলা বদলি করা হয়েছে। তবে কয়েকটি জেলায় এরূপে বদলিকৃত মামলার সংখ্যার কম। উক্তরূপে "বিশেষ আদালত আইন, ২০০৩" এর অধীনে মামলা বদলি সত্ত্বেও নিষ্পত্তির সামগ্রিক অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি যা পূর্ববর্তী ছকগুলো থেকে স্পষ্ট।

৫. লিগ্যাল এইড কার্যক্রমের মাধ্যমে এডিআর পদ্ধতির সফলতা

বেশ কিছু জেলায় আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর অধীনে লিগ্যাল এইড কার্যক্রমে কর্মরত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ এডিআর পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের প্রমাণ রেখেছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সিনিয়র সহকারি জজ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এডিআর কার্যক্রমে অপেক্ষাকৃত কম জটিল মামলাগুলো, বিশেষত পারিবারিক মামলা এবং অনুরূপ ছোট ছোট মামলা নিষ্পত্তি করে থাকেন। অন্যান্য মামলাও বিশেষত টাকা পয়সার লেনদেন সংক্রান্ত ফৌজদারি মামলা, নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১ এর ১৩৮ ধারার মামলা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪৫ ধারায় উল্লিখিত দণ্ডবিধির বিভিন্ন আপোশযোগ্য ধারার মামলাগুলোকে লিগ্যাল এইড তথা এডিআর কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা যেতে পারে।

উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন এবং প্রয়োজনে ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধনক্রমে অপেক্ষাকৃত বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাগণ, যেমন যুগ্ম জেলা জজ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে এডিআর/লিগ্যাল এইড কার্যক্রমে নিযুক্ত করা যেতে পারে।

৬. সুপারিশকৃত পদক্ষেপঃ

(ক) দীর্ঘ মেয়াদি সংস্কার প্রস্তাব

(১) সুপ্রীম কোর্টের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ;
(২) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য একটি কমিশন (৩য় অধ্যায়) গঠন;
(৩) অধস্তন আদালতের বিচারক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যমান পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংস্কার (৪থ অধ্যায়);
(৪) বিচার বিভাগের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস (৭ম অধ্যায়) প্রতিষ্ঠা;
(৫) দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত কাজ পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস (৯ম অধ্যায়) প্রতিষ্ঠা;
(৬) আইনজীবীদের যথাযথ প্রক্রিয়ায় তালিকাভুক্তিকরণ ও মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ (২৬শ অধ্যায়);
(৭) সুপ্রীম কোর্টসহ সকল আদালতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা (৫ম ও ১৪শ অধ্যায়);
(৮) বিচার বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ (১২শ অধ্যায়) এবং যথাসম্ভব নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা;
(৯) বিভিন্ন আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা কর্মচারি নিয়োগের (১১শ অধ্যায়) জন্য বিদ্যমান পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংস্কার;
(১০) মামলা মোকদ্দমা এবং বিচার বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের আস্থা সৃষ্টির জন্য সামগ্রিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা (১৭শ অধ্যায়) বৃদ্ধি;
(১১) বিচার বিভাগের যথাযথ বিকেন্দ্রীকরণ (৬ঠ অধ্যায়);

(১২) গ্রাম পর্যায়ে ছোট ছোট বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয়ভাবে কার্যকর এডিআর ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং প্রয়োজনে লিগ্যাল এইড কার্যক্রমের সহায়তা গ্রহণ (১৮শ ও ১৯শ অধ্যায়);
(১৩) বিচার ব্যবস্থায় জনগণের অভিগম্যতা (Access to Justice) নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর এবং জনবান্ধব পুলিশি সহায়তা এবং লিগ্যাল এইড কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ (১৮শ অধ্যায়);
(১৪) বর্তমানে চালু থাকা গ্রাম আদালতের আমূল সংস্কারের মাধ্যমে বিচারকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানো (২১শ অধ্যায়);
(১৫) বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জন সচেতনতা বৃদ্ধি (১৭শ অধ্যায়)।

(খ) স্বল্প দেয়াদি সংস্কার প্রস্তাব: বিদ্যমান জট নিরসন কল্পে জরুরি ভিত্তিতে নিম্ন বর্ণিত স্বল্প মেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে-

(১) অধিক সংখ্যক ফৌজদারি আপীল, ফৌজদারি রিভিশন, দেওয়ানি আপীল ও দেওয়ানি রিভিশন নিষ্পন্নাধীন আছে এরূপ জেলায় অবসরপ্রাপ্ত সৎ, দক্ষ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজদের ২/৩ বছরের মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০০০টি আপীল/রিভিশন বিচারাধীন আছে এরূপ জেলাতে চুক্তি ভিত্তিক জেলা জজগণকে নিয়োগ করা যেতে পারে।
(২) অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজকে বিশেষ আদালত আইন ২০০৩ সংশোধনক্রমে এবং সরকারি চাকরি আইন ২০১৮ এর ৪৯ ধারা অনুসারে নিয়োগ করা যেতে পারে। উক্তরূপ চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের জন্য আইন সংশোধনের পূর্বে মাসদার হোসেন মামলায় প্রদত্ত কনটিন্যুয়াস ম্যানডামাস (Continuous Mandamus) এর আওতায় প্রণীত বিধিমালার সাথে সম্ভাব্য আইনগত জটিলতা এড়ানোর জন্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের অনুমতি গ্রহণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, উক্তরূপে চাকরি বিধিমালায় শুধুমাত্র পদোন্নতির মাধ্যমে জেলাজজ নিয়োগের বিধান আছে।
(৩) জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন আদালতে নিষ্পন্নাধীন বিপুল সংখ্যক ফৌজদারি মামলার (২১ লক্ষ+) একটি বিরাট অংশ সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে মিথ্যা মামলা মর্মে নানাবিধ প্রচার মাধ্যমে বলা হয়ে থাকে। তবে প্রচার মাধ্যমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এসব মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা যাবে না। বরং প্রতিটি মামলার নথিপত্র পরীক্ষাক্রমে সহজেই ঐসব মামলার আংশিক সত্যতা বা অসত্যতা সম্পর্কে একটি কার্যকর ধারণা পাওয়া যাবে। তাই প্রশাসনিকভাবে সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা এবং তদন্তাধীন মামলার ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তাকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া, বিচার শুরু হয়ে গেছে অথচ দীর্ঘদিন সাক্ষী আসছে না বিধায় অনিষ্পন্ন আছে এরূপ মামলার ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির ২৪৯ ও ২৬৫জ ধারা অনুসারে সাক্ষ্য কার্যক্রম বন্ধ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আইন কর্মকর্তাগণ আদালতকে অনুরোধ করবেন মর্মে নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে।
(৪) পাবলিক প্রসিকিউটর এবং অন্যান্য আইন কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে প্রত্যাশিত ত্বরিত ও দক্ষ সেবা পাওয়ার জন্য কয়েকটি বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। যথা:
   (ক) পিপি/জিপিগণের জন্য অ্যাসিসটেন্ট অ্যাটর্নি জেনারেল এর সমমর্যাদার আর্থিক সুবিধা এবং অন্যান্য আইন কর্মকর্তার (এডিশনাল পিপি/জিপি ইত্যাদি) জন্য যুক্তিসঙ্গত হারে পারিশ্রমিক এর ব্যবস্থা করতে হবে।
   (খ) ভাড়ার ভিত্তিতে তাদের জন্য ভৌত অবকাঠামো, বিশেষত অফিসের ব্যবস্থা করতে হবে।
   (গ) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সহায়ক জনবল নিয়োগ এর ব্যবস্থা করতে হবে।
   (ঘ) মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পুলিশের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।
   (ঙ) সংশ্লিষ্ট আদালতের বাইরে অবস্থানরত সাক্ষীদের ই-টেকনোলজির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণের সুযোগ রাখতে হবে। এ বিষয়ে সাক্ষ্য আইন ও সুপ্রীম কোর্টের ২০ আগস্ট ২০২৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৪৯০এ, এর মাধ্যমে প্রকাশিত প্র্যাকটিস ডাইরেকশন প্রতিপালন করতে হবে।

একবিংশ অধ্যায়: গ্রাম আদালত

১. ভূমিকা: সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় গ্রাম আদালতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম পর্যায়ের ছোটখাটো বিরোধ সহজ ও শান্তিপূর্ণভাবে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রণীত গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৭৬। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে স্থানীয় পর্যায়ের এই আদালত ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর ও শক্তিশালী করার জন্য প্রণীত হয় গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬। উক্ত আইন অনুসারে গ্রাম আদালতের প্রক্রিয়ায় সাক্ষ্য আইনসহ পদ্ধতিগত বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ না থাকায় মানুষকে দ্রুত প্রতিকার দেয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রথাগত আদালতের ধ্যান-ধারণার বাইরে গিয়ে স্থানীয় পর্যায়ের মানুষকে প্রতিকার প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত হতে পারে একটি কার্যকর ব্যবস্থা। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রাম আদালতের মামলা নিষ্পত্তির হার আশাব্যঞ্জক নয়। তৎপ্রেক্ষিতে গ্রাম আদালত সম্পর্কিত বিষয়গুলো পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে উপস্থাপন করা হল।

২. গ্রাম আদালতের সমস্যা: বর্তমানে গ্রাম আদালতে যে সমস্যাগুলো পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ:

- **গঠনজনিত সমস্যা:** গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানসহ ২ জন সদস্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। এসব প্রতিনিধিদের অনেকেরই গ্রাম আদালত বা স্থানীয় সালিস বিচার নিয়ে পূর্ব ধ্যান-ধারণা বা অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকে। এ কারণে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম কার্যকর ও গতিশীল হচ্ছে না। আবার বিদ্যমান আইন অনুসারে গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়ন নিয়েও বেশ বিলম্ব হয়।
- **বিচারিক প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম বিচারিক মানের ঘাটতি:** 'গ্রাম আদালত' এর নামে যেহেতু 'আদালত' অভিব্যক্তিটি আছে সেহেতু এই আদালতের যাবতীয় কার্যধারায় বিচার প্রক্রিয়ার ন্যূনতম শর্তাবলির প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু গ্রাম আদালতে অভিগম্যতা, আদালত কক্ষের পরিবেশ, উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ, জবানবন্দি বা সাক্ষ্যের সারমর্ম লিপিকরণ, আদালতের সিদ্ধান্ত লিপিকরণের প্রক্রিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ন্যূনতম যে বিচারিক মানদণ্ড রয়েছে তা নিশ্চিত করা হয় না।
- গ্রাম আদালতের জন্য নির্ধারিত সময়সূচি নেই।
- গ্রাম আদালতের কার্যক্রম আইন মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে কোনো তদারকি ব্যবস্থা নেই। ফলে গ্রাম আদালতের কার্যক্রমে ভুল ত্রুটি থেকে যাচ্ছে।
- গ্রাম আদালতের মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা অপেক্ষাকৃত বেশি। গ্রাম আদালতে একটি মামলা/মামলার আবেদন দায়ের থেকে নিষ্পত্তি পর্যন্ত সময়সীমা আইনে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। উক্ত আইন অনুসারে মামলা বিচারের জন্য গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন থেকে শুরু করে রায় প্রদান পর্যন্ত একজন বিচারপ্রার্থী ব্যক্তিকে সাড়ে ৫ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।
- **থানা বা আদালত কর্তৃক গ্রাম আদালতে মামলা প্রেরণের ক্ষেত্রে সমস্যা:** বিদ্যমান আইন অনুসারে চার্জ গঠনের পূর্বে গ্রাম আদালতে মামলা প্রেরণের সুযোগ নেই। অর্থাৎ কোনো মামলা প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে গ্রাম আদালতে বিচার্য প্রতীয়মান হলেও প্রাথমিক অবস্থায় এটি সেখানে প্রেরণের সুযোগ নেই। ফলশ্রুতিতে মামলার পক্ষগণের সময় অপচয় হচ্ছে, অনর্থক অর্থ ব্যয় হচ্ছে এবং নানাবিধ হয়রানির শিকার হচ্ছে।
- গ্রাম আদালতের নিরাপত্তাজনিত ঘাটতি রয়েছে।
- গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বিচারিক প্রশিক্ষণে ঘাটতি রয়েছে।

৩. সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:

১. গ্রাম আদালত গঠনের ক্ষেত্রে সমস্যা দূরীকরণ: গ্রাম আদালতের বিদ্যমান কাঠামোর অতিরিক্ত হিসেবে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা প্যানেল গঠন করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ

এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য শিক্ষিত ব্যক্তির সমন্বয়ে উপদেষ্টা প্যানেল গঠিত হবে। গ্রাম আদালত গঠনের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হলে চেয়ারম্যান উপদেষ্টা প্যানেলের কোনো সদস্যকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম আদালতের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দিতে পারবে। গ্রাম আদালত নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনা, মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে উপদেষ্টা প্যানেলের যেকোনো সদস্যের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম আদালত পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে। উপদেষ্টা প্যানেল গঠনের বিধান গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এ সন্নিবেশিত করতে হবে।

২. গ্রাম আদালতের বিচারিক প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম বিচারিক মান রক্ষার জন্য করণীয়: এজলাস বা আদালত কক্ষের কর্ম পরিবেশসহ গ্রাম আদালতের সকল কার্যক্রমে বিচারিক পরিবেশ, বিচারিক মূল্যবোধ এবং যথাযথ বিচারিক পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলন নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাম আদালতের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনাসহ আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে: (ক) সহজে দরখাস্ত দাখিলসহ আদালতে অভিগম্যতা; (খ) আদালত কক্ষে নারীসহ অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের জন্য যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ; (গ) পক্ষগণের বক্তব্য শ্রবণ; (ঘ) সাক্ষীদের শপথ গ্রহণে অনাগ্রহ; (ঙ) জবানবন্দি বা সাক্ষ্য লিপিকরণে আদালতের অনাগ্রহ; (চ) আদালতের সিদ্ধান্ত লিপিকরণের প্রক্রিয়া; (ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রায়ের অনুলিপি সরবরাহ করা; (জ) প্রয়োজনীয় ফরম, রেজিস্টারসহ অন্যান্য রেকর্ড সংরক্ষণ ইত্যাদি।

৩. গ্রাম আদালতের জন্য নির্ধারিত সময়সূচির ব্যবস্থা করা: গ্রাম আদালতের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়সূচি ধার্য করতে হবে। সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিন গ্রাম আদালতের জন্য নির্ধারিত থাকতে হবে।

৪. গ্রাম আদালতের উপর বিচারিক তত্ত্বাবধান ও তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা: জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার যেহেতু জেলা পর্যায়ে প্রেষণে কর্মরত বিচার বিভাগের একজন সদস্য সেহেতু তার সভাপতিত্বে একটি তদারকি কমিটি গঠন করতে হবে।

তদারকি কমিটি

১.	জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার	সভাপতি
২.	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৩.	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য

তদারকি কমিটির কার্যাবলি

১. গ্রাম আদালত তদারকি কমিটি গ্রাম আদালতের বিচারিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও তদারকি করবেন;
২. তদারকি কমিটির সদস্যগণ সময়ে সময়ে গ্রাম আদালত পরিদর্শন করবেন;
৩. কমিটি গ্রাম আদালতের বিচারিক কার্যক্রম স্বচ্ছ, কার্যকর ও গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় সার্কুলার, নির্দেশনা ইত্যাদি জারির উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;
৪. কমিটি গ্রাম আদালতের বিচারিক কার্যক্রমের মানোন্নয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রস্তাব প্রদান করবেন।

৫. গ্রাম আদালতের মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা কমানো: গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর ধারা ৬(গ)(২) এ উল্লিখিত সময়সীমা নিম্নরূপে সংশোধনের বিষয়ে কমিশন প্রস্তাব করছে:

ধারা	মামলার স্তর	নির্ধারিত সময়	প্রস্তাবিত সময়সীমা
৪	গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন	--	
৬(খ)(১)	আদালত গঠিত হওয়ার পর প্রথম অধিবেশন	১৫ দিন	---
৬(খ)(২)	আপোশ বা মীমাংসার মাধ্যমে বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করা হলে উহার নিষ্পত্তি	১৫ দিন	---
৬(গ)(১)	আপোশ বা মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে মামলাটির শুনানির কার্যক্রম শুরু	১৫ দিন	---
৬(গ)(২)	শুনানির কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর মামলার নিষ্পত্তি	৯০ দিন	৬০ দিন
৬(গ)(২)	এরই মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে অতিরিক্ত সময়	৩০ দিন	১৫ দিন

৬. থানা বা আদালত কর্তৃক গ্রাম আদালতে মামলা রেফারেলের ক্ষেত্রে সমস্যা দূরীকরণ: সহকারি জজ বা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মামলা গ্রহণকালে প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ে মামলাটি গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য প্রতীয়মান হলে এটি তিনি সংশ্লিষ্ট গ্রাম আদালতে প্রেরণ করতে পারবে মর্মে বিদ্যমান বিভিন্ন পদ্ধতিগত আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা যেতে পারে।

৭. গ্রাম আদালতের নিরাপত্তাজনিত ঘাটতি দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ: গ্রাম আদালতের কার্যক্রম চলাকালে নিরাপত্তার জন্য গ্রাম পুলিশের একটি দলকে নিয়োজিত করতে হবে অথবা প্রয়োজনে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করতে হবে।

৮. আপীল আদালত কর্তৃক গ্রাম আদালত পরিদর্শন: গ্রাম আদালতের আপীল আদালত হিসেবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের এখতিয়ার সম্পন্ন সহকারি জজ এবং জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সময়ে সময়ে গ্রাম আদালত পরিদর্শন করবেন। স্থানীয় সরকার বিভাগ উক্ত পরিদর্শন কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

৯. গ্রাম আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়: মোবাইল কোর্ট

১. ভুমিকা: মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ৫ অনুযায়ী সরকার সমগ্র দেশে কিংবা যে কোন জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায় যে কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে, এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তার আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে যে কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ দ্বারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলে বর্তমানে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে মোবইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। তফসিলভুক্ত আইনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: দণ্ড বিধি, ১৮৬০; বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫; বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬; ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯; নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮, ইত্যাদি।

২. মোবাইল কোর্টের কার্যপদ্ধতি: মোবাইল কোর্ট আইনের ধারা ৭ অনুযায়ী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে তার উপস্থিতিতে তফসিলভুক্ত আইনের অধীন অপরাধ সংঘটিত হলে ঘটনাস্থলেই উক্ত অপরাধ আমলে গ্রহণ করতে পারেন। অপরাধ আমলে নেওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত অভিযোগ লিখিত আকারে তৈরি করেন এবং তা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শোনান এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ স্বীকার করেন কি না এই মর্মে তার কাছে জানতে চান। অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ স্বীকার করলে তার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়। লিপিবদ্ধ স্বীকারোক্তিতে অভিযুক্তের স্বাক্ষর বা টিপসই এবং উপস্থিত দুইজন সাক্ষীর স্বাক্ষর বা ক্ষেত্রমতে টিপসই নেওয়া হয়। এরপর ম্যাজিস্ট্রেট লিখিত আদেশে স্বাক্ষর প্রদান করে উপযুক্ত দণ্ড আরোপ করতে পারেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ অস্বীকার করলে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়। অভিযুক্তের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হলে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন। আর যদি ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হয়, তবে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগটি বিচারার্থে উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে প্রেরণ করতে পারেন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড আরোপ করা যায়। মোবাইল কোর্ট কর্তৃক অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে আইনে নির্ধারিত সীমার মধ্যে যে কোনো পরিমাণ অর্থদণ্ড আরোপ করা যায়, যা তাৎক্ষণিকভাবে আদায়যোগ্য। তবে, তাৎক্ষণিকভাবে তা আদায় করা না গেলে অনধিক তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড আরোপ করা যায়।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রথমত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপিল করতে পারেন। উক্ত আপিল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিজে শুনানি করেন অথবা তার অধীনস্ত অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তা প্রেরণ করেন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পরবর্তী আপিল সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালতে দায়ের করা যায়।

৩. সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন মামলা: মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর বৈধতা বিষয়ে ২০১৭ সালে হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত তিনটি রিট আবেদনের (নম্বর: ৮৪৩৭/১১, ১০৪৮২/১১ এবং ৪৮৭৯/১২) একত্রে শুনানি শেষে আদালত মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫, ৬(১), ৬(২), ৬(৪), ৭, ৮(১), ৯, ১০, ১১, ১৩ ও ১৫-কে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে ঘোষণা করেন। আদালত এই আইনকে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর দু'টি উপাদান, অর্থাৎ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ-এর নীতির পরিপন্থী বলে সিদ্ধান্ত দেন। রায়ে হাইকোর্ট বিভাগ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন

ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে সংবিধান এবং মাসদার হোসেন মামলার রায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার বিষয়ে পর্যবেক্ষণ দেন। পরবর্তীতে হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার আপিল দায়ের করে, যা বর্তমানে আপিল বিভাগে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

৪. মোবাইল কোর্ট আইনের ব্যাপারে আপত্তি: মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর বিষয়ে প্রধান সমালোচনাগুলো নিম্নরূপ:

(ক) এই আইনের মাধ্যমে একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যা নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের নীতির পরিপন্থী।

(খ) এই আইন অনুযায়ী একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বিচারের মৌলিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ না করেই অভিযুক্তের 'স্বীকারোক্তি'র ভিত্তিতে ২ (দুই) বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড আরোপ করতে পারেন, যা সংবিধানের ৩২, ৩৩ ও ৩৫ অনুচ্ছেদে বিধৃত মৌলিক অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক। পক্ষান্তরে, এর চেয়ে কম দণ্ড আরোপের ক্ষেত্রেও একজন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে বিচারের কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

(গ) সাধারণত সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনের তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা সংসদের কাছে থাকলেও মোবাইল কোর্ট আইনের ১৫ ধারায় এই আইনের তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা ব্যবহার করে সরকার তফসিলে নতুন নতুন আইন সংযোজন করছে, যার ফলে বর্তমানে তফসিলে ১১৬টি আইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে মোবাইল কোর্টের অধিক্ষেত্রের এধরণের সম্প্রসারণ আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির পরিপন্থী ।

৫. মোবাইল কোর্টের উপযোগিতা: বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে মোবাইল কোর্টের উপযোগিতার বিষয়ে যেসব যুক্তি সাধারণত উপস্থাপিত হয়, তার মধ্যে রয়েছে:

(ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধ সংঘটিত হওয়ার স্থানেই দ্রুততার সাথে তার প্রতিকার করতে সক্ষম হন; এভাবে অপরাধীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক শাস্তির উদাহরণ সৃষ্টি হওয়ায় একই ধরনের অপরাধের প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়;

(খ) মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া এড়িয়ে স্বল্প সময়ে বিচারিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়; ফলে জনগণের কাছে তা আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা তৈরিতে সহায়তা করে;

(গ) মোবাইল কোর্ট প্রধানত পরিবেশ সংরক্ষণ, নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ, ভোক্তা অধিকার, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, এবং অনুরূপ জনসংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিচালিত হয় বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এর বিশেষ জনপ্রিয়তা রয়েছে।

৭. সুপারিশকৃত প্রস্তাব: মোবাইল কোর্ট আইন-এর সাংবিধানিকতা বিষয়ে আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলায় বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসা হবে। ইতোমধ্যে, বাস্তবতার নিরিখে মোবাইল কোর্টের প্রয়োজনীয়তা, এবং এর সমান্তরালে মোবাইল কোর্ট আইন-এর সাংবিধানিক ও আইনগত অসঙ্গতিগুলোর বিবেচনায়, সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিম্নরূপ:

(ক) কোন ব্যক্তিকে আইনের আশ্রয় লাভের যথাযথ সুযোগ না দিয়ে কারাদণ্ড আরোপ করা সংবিধানের ৩২, ৩৩ ও ৩৫ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের সাথে অসাঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় মোবাইল কোর্ট আইন সংশোধন করে মোবাইল কোর্টের কারাদণ্ড আরোপের ক্ষমতা রহিত করা প্রয়োজন। এর ফলে মোবাইল কোর্ট স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে আইনে নির্ধারিত অর্থদণ্ড আরোপ করতে পারবে, এবং তার তল্লাশি (search), জব্দ (seizure) এবং জব্দকৃত বস্তু বিলিবন্দেজ (disposal) সম্পর্কিত ক্ষমতাও বহাল থাকবে।

(খ) অর্থদণ্ড আদায়ে জটিলতা নিরসনে সাধারণ কর্মঘণ্টার মধ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় গুরুত্বারোপ করা বাঞ্ছনীয়। ক্ষেত্রবিশেষে, সাধারণ কর্মঘণ্টার বাইরে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার একান্ত প্রয়োজন হলে এর মাধ্যমে আরোপিত অর্থদণ্ড আদায়ে অভিযুক্তকে যৌক্তিক সময় ও সুযোগ প্রদান করতে হবে।

(গ) মোবাইল কোর্ট আইনের ১৫ ধারা রহিত বা সংশোধন করে করে শুধুমাত্র সংসদ কর্তৃক আইনের তফসিল সংশোধনের বিধান প্রণয়ন করা আবশ্যক।

(ঘ) নিরপেক্ষ বিচারিক প্রক্রিয়ায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার স্বার্থে মোবাইল কোর্ট আইনের ১৩ ধারার প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে সরাসরি সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালতে আপিল দায়েরের বিধান করা প্রয়োজন। আপিল দায়েরের অধিকার যাতে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায়, তার জন্য দণ্ডাদেশ প্রদানের পর সর্বোচ্চ ২ (দুই) কর্মদিবসের মধ্যে অভিযুক্তকে আদেশের নকল সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা জরুরি। নকল যথাসময়ে না পাওয়া গেলে হলফনামা সম্পাদনের মাধ্যমে অভিযুক্তকে আপিল দায়েরের সুযোগ দেয়ার বিধান প্রণয়ন করলে ন্যায়বিচারের পথ সুগম হবে।

(ঙ) জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা, এবং যেসব পরিস্থিতিতে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা যথাযথ ও বাস্তবসম্মত হবে না, শুধুমাত্র সেই সব ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়: আইনের সংস্কার

ভূমিকা: সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুয়ায়ী কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে একটি 'স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর' বিচার বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করা। এই দায়িত্বের নিরিখে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে বিচার বিভাগের উক্ত তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে নানাবিধ প্রস্তাব করা হয়েছে এবং সেগুলোতে সংশ্লিষ্ট আইন সংস্কারের প্রস্তাবও অন্তর্ভুক্ত আছে। এসব সংস্কার প্রস্তাব ছাড়াও বিচার বিভাগকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর করতে এবং মামলা পরিচালনার খরচ ও সময় কমিয়ে স্বল্প সময়ে বিচার প্রার্থীদের ন্যায়বিচার প্রদান করতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় অধিক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ে আইনের সংশোধন, সংযোজন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন। তদনুসারে কমিশন নিম্নরূপ সুপারিশ করছে।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:**

১. মামলা দায়ের পর্যায়ে বিচার অভিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক নিরীক্ষণ: মামলা দায়ের স্তরে উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচারক এবং জেলা পর্যায়ে Judicial Administrative Officer (JAO) অফিসার দায়েরকৃত মামলা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিবেন। JAO হবেন একজন যুগ্ম জেলা জজ পর্যায়ের কর্মকর্তা যিনি কোনো বিচারিক দায়িত্ব পালন করবেন না। বরং, আদালত ও মামলা ব্যবস্থাপনার সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব তদারকি ও নির্বাহ করবেন। এই উদ্দেশ্যে JAO এর পদ সৃষ্টির জন্য আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার বা সংশোধন করতে হবে।

২. সমন জারিতে দীর্ঘসূত্রিতা রোধকরণ:

- জারিকারকদের ভ্রমণভাতা প্রদানের জন্য আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
- সমন জারির প্রমাণ হিসাবে সমন গ্রাহকের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও স্বাক্ষর সংগ্রহ পূর্বক জারির প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

৩. আরজির সাথে দাবির সমর্থনে দলিল দাখিলের বিধান: আরজির সাথে দাবির সমর্থনে দলিল দাখিলের বিধান রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে অনেক সময় এই বিধান অনুসরণ করা হয় না। তাই এ বিধান কে আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে আরজির সাথে দাবির সমর্থনে দলিল দাখিল না করলে তার পরিণাম হিসাবে সুনির্দিষ্ট ফলাফল সম্বলিত বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪. জবাব দাখিল বিষয়ে সংস্কার: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিবাদীকে জবাব দাখিল করতে হবে। জবাবে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে: (ক) বাদীর দাবির কোন কোন বিষয় বিবাদী স্বীকার করে; (খ) বিবাদীর সুনির্দিষ্ট দাবি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে; এবং (গ) বিবাদী কর্তৃক অস্বীকৃত বিষয়গুলোর প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা ভাবে অস্বীকৃতি প্রদান না করে এই মর্মে সাধারণ বক্তব্য প্রদান করতে হবে যে সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকৃত দাবি ব্যতীত, বাদীর সব দাবি বিবাদী অস্বীকার করে।
এ বিষয়ে সংস্কারের জন্য দেওয়ানী কার্যবিধির ৮ আদেশের ৩-৫ বিধি সংশোধন করতে হবে।

৫. ইস্যু গঠন : উভয় পক্ষ কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে সুনির্দিষ্ট খসড়া ইস্যু উত্থাপন করতে হবে এবং আদালত কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে ইস্যু গঠন করতে হবে। ইস্যু গঠনের পূর্বে ডিসকভারি, ইন্সপেকশন এবং ইন্টারোগেটরি সম্পর্কিত বিধান বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিপালন করতে হবে। পক্ষগণ যেন এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে সে বিষয়ে আদালতকে জোর প্রদান করতে হবে।

৬. ইস্যু গঠনের পরে: বিদ্যমান এডিআর সংক্রান্ত বিধান নানা কারণে বাস্তবে অনুসৃত হয় না। সে কারণে যথাযথ মামলায় আদালতের নিজস্ব উদ্যোগে লিগ্যাল এইড অফিসারের মাধ্যমে মামলার পক্ষগণকে আপোশ নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা গ্রহণের নির্দেশ দিতে হবে।

৭. বিচার পর্যায়ে: বিচার শুরু হওয়ার পরে ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে বিচার শেষ করতে হবে।

৮. দেওয়ানি আপিল/রিভিশন: দেওয়ানি আপিল বা রিভিশন এর ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত অতি সংক্ষিপ্ত আকারে দায়সারা গোছের দাবি উত্থাপনের বিধান সংশোধন করে বিস্তারিত কারণ ও যুক্তি সম্বলিত আপিলের মেমো দাখিলের বিধান করতে হবে। আপিল দায়েরের সময়সীমা বর্তমানের চেয়ে দুই গুণ বৃদ্ধি করতে হবে, যেন আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে কোনো পক্ষ অসুবিধার না পড়ে। আপিলের প্রতিদ্বন্দ্বীপক্ষ একইভাবে বিস্তারিত উত্তরসহ লিখিত আপত্তি দাখিল করবে। আপিল/রিভিশন শুনানিতে পক্ষগণ বা পক্ষগনের অ্যাডভোকেট উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক উল্লিখিত বিস্তারিত আপিল মেমো ও আপত্তির ভিত্তিতে আপীল আদালতকে রায় প্রদান করতে হবে।

৯. দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ সংশোধন করে আরজি ও লিখিত বর্ণনার বক্তব্যকেই সাক্ষ্য (জবানবন্দি বা examination-in-chief) হিসেবে সাব্যস্ত করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১০. মামলার খরচ নির্ধারণের লক্ষ্যে যুক্তিতর্ক শুনানির সময় পক্ষগণ কর্তৃক স্ব স্ব খরচের হিসাব দাখিল করার বিধান দেওয়ানি কার্যবিধি আইনে সংযোজন করতে হবে এবং খরচসহ ডিক্রি প্রদান বাধ্যতামূলক করার জন্য দেওয়ানি কার্যবিধি ৩৫ নম্বর ধারাটি সংশোধন করতে হবে।

১১. ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ৩৫ক। (১) ধারায় মিথ্যা ও বিরক্তিকর মামলার জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ ২০,০০০.০০ টাকার স্থলে আদালত কর্তৃক বিধি মোতাবেক ধার্যযোগ্য করে ৩৫ক ধারাটি সংশোধন করতে হবে।

১২. জাল দলিল দাখিলের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতকে ফৌজদারি আদালতের ন্যায় দণ্ডারোপ করার এখতিয়ার প্রদান করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

১৩. ডিক্রিজারিতে বাধা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখার ক্ষেত্রে ডিক্রিদার কর্তৃক আদালতে দায়িকের Subsistence Allowance জমা দেওয়া সংক্রান্ত দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৫৭ ধারা এবং ২১ আদেশের ৩৯ বিধিটি বাতিল করতে হবে।

১৪. The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ৪৮০ ধারাটি সংশোধন করে উক্ত ধারায় বর্ণিত ক্ষেত্রে আদালত অবমাননার জন্য ০১ (এক) বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার ক্ষমতা আদালতের উপর অর্পণ করতে হবে। উক্ত আইনের ৪৮২ ধারাটি বাতিল করতে হবে।

১৫. The Code of Civil Procedure, 1908 এর Order XXXVII প্রতিস্থাপন করতে হবে। এখানে বর্ণিত Summary Procedure এর বিধান শুধু Negotiable Instruments এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উক্ত বিধান সংশোধন করে দেওয়ানী মামলার অন্যান্য ক্ষেত্রেও পক্ষগণের সম্মতিতে উহা প্রয়োগ করার বিধান প্রবর্তন করতে হবে।

১৬. ফৌজদারি কার্যবিধির ৭০ ধারার বিধান সংশোধন করে পরিবারের যেকোনো প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যের উপর সমন জারি করা যাবে মর্মে বিধান করতে হবে।

১৭. সরকারি কর্মচারিদের ওপর সমন জারির পাশাপাশি বা ব্যতীত ফ্যাক্স বা ই-মেইল এর মাধ্যমে সমন জারির বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৮. আদালতে আসামীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৩৯ক ধারায় উল্লিখিত দুইটি বাংলা জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন প্রকাশের বিধান বাতিল করে রাজধানী থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং আসামির স্থানীয় এলাকা থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের বিধান করতে হবে।

১৯. ফৌজদারি আপিল বা রিভিশন এর ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত অতি সংক্ষিপ্ত আকারে দায়সারা গোছের মেমো দাখিলের বিধান সংশোধন করে বিস্তারিত কারণ ও যুক্তি সম্বলিত আপিলের মেমো দাখিলের বিধান করতে হবে। আপিলের প্রতিদ্বন্দ্বীপক্ষ একইভাবে বিস্তারিত উত্তরসহ লিখিত আপত্তি দাখিল করবে। আপিল/রিভিশন শুনানিতে

পক্ষগণ বা পক্ষগণের অ্যাডভোকেট উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক উল্লিখিত বিস্তারিত আপিল মেমো ও আপত্তির ভিত্তিতে আপীল আদালতকে রায় প্রদান করতে হবে।

২০. ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের জরিমানা আরোপের ক্ষমতা যুগোপযোগী করতে হবে এবং সরকার প্রতি পাঁচ বছর পর পর জরিমানার এই এখতিয়ার পুনঃনির্ধারণ করবেন মর্মে আইনে বিধান সংযোজন করতে হবে।

২১. দণ্ডবিধিসহ অন্যান্য আইনের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত অপ্রতুল জরিমানার বিধান সংশোধন করে যুগোপযোগী করতে হবে এবং প্রতি পাঁচ বছর পর পর জরিমানার পরিমাণ সংসদ কর্তৃক পুনঃনির্ধারণ করতে হবে।

২২. সাক্ষী ও ভিকটিমের সুরক্ষা, ভিকটিমের ক্ষতিপূরণ ও সাক্ষীর খরচ বিষয়ে প্রস্তাবঃ

(১) ভিকটিম ও সাক্ষীর এবং তাদের পরিবারের সদস্য ও সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে। তাছাড়া, সাক্ষীদের যাতায়াত খাওয়া বাবদ খরচ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) সাক্ষীদের সুরক্ষা নিশ্চিতে পুলিশের একটি সাক্ষী প্রটেকশন সেল গঠন করতে হবে। সাক্ষী ও ভিকটিমের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য সাক্ষী প্রটেকশন সেল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সাক্ষী ও ভিকটিমের নিরাপত্তায় সকল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও সরকারি বেসরকারি দপ্তর ও ব্যক্তি সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবে মর্মে বিধান করতে হবে। নিরাপত্তার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট আদালত মনিটর করবে।

(৩) ভিকটিমকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪৫ ধারা সংশোধন করতে হবে।

২৩. দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ১৪৩ ধারাটি আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে আপোশযোগ্য করে আইন সংশোধন করতে হবে।

২৪. তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে এরূপ অপরাধ প্রথমবার সংঘটনের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে প্রবেশন আদেশ অথবা শুধু জরিমানা দণ্ড প্রদানের বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২৫. দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ২৯ এর 'উড়পঁসবহঃ' এর সংজ্ঞাকে সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ৩ ধারায় সংজ্ঞায়িত 'Document' এর সমরূপ করতে হবে।

২৬. "জাস্টিস অব দ্য পিস" এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি আইনে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করতে হবে।

২৭. ফৌজদারি কার্যবিধিতে Plea Bargaining এর বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২৮. ফৌজদারি কার্যবিধিতে শাস্তি সংক্রান্ত শুনানি (Sentencing hearing) পুনঃপ্রবর্তন এবং পৃথক দণ্ড প্রদান নির্দেশিকা (Sentencing guideline) প্রণয়ন করতে হবে।

২৯. ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারা সংশোধন করে শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যুগোপযোগী করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়াও অন্যান্য সকল ফৌজদারি আদালতকে একই ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে।

৩০. একই ঘটনা থেকে উদ্ভূত অপরাধে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর সাথে প্রাপ্ত বয়স্ক আসামি থাকলে তাদের বিচার যাতে শিশু আদালত আলাদা আলাদাভাবে করতে পারেন সে জন্য শিশু আইন, ২০১৩ সংশোধন করতে হবে।

৩১. মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ধারা ১০ এই মর্মে সংশোধন করা প্রয়োজন যে,

(ক) বিবাহের সময় নিকাহনামাতে মোহরানার পরিমাণ টাকায় নির্ধারণের সাথে সাথে সমমূল্যে স্বর্ণের পরিমাণ (স্বর্ণের ক্যারেটসহ) উল্লেখ করতে হবে এবং পরিশোধের সময় উল্লিখিত স্বর্ণের পরিমাণের ভিত্তিতে পরিশোধযোগ্য মোহরানার অংক নির্ধারণ করতে হবে।

(খ) যেহেতু মোহরানা পরিশোধ করা ধর্মীয় দায়িত্ব এবং কেবলমাত্র চুক্তি হতে উদ্ভূত দায় নয়, সেহেতু মোহরানার দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে তামাদি আইন প্রযোজ্য হবে না।

চতুর্বিংশ অধ্যায়: বিচারক ও সহায়ক জনবলের প্রশিক্ষণ

১. ভূমিকা: কার্যকর বিচারব্যবস্থার সুফল বিচারপ্রার্থী মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হলে বিচারকদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। বিচারকদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। রাষ্ট্র বিচারকগণের দক্ষতা ও বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে যে অর্থ খরচ করবে আর্থিক বিচারে তার বহুগুণ প্রাপ্তি মিলবে জনসাধারণের প্রতি সঠিক বিচারসুবিধা প্রদানের মাধ্যমে।

২. প্রশিক্ষণের সুযোগ: কল্যাণ-রাষ্ট্র মাত্রই তার জনগণের জন্য সবচেয়ে চমৎকার ও কার্যকর সেবা নিশ্চিত করতে চায়। বিচারসংক্রান্ত সেবা এই চাওয়ার বাইরে নয়। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ বিচারকের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিচারিক সেবার মান নিঃসন্দেহে বেশি। ফলে বিচারকের জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, স্কলারশিপ, ফেলোশিপ, বৈদেশিক অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচির আয়োজন করলে, রাষ্ট্রের জনগণ দীর্ঘমেয়াদে তার সুফল ভোগ করবেন মানসম্মত বিচারসেবা প্রাপ্তির মাধ্যমে। ফলে বিচারকগণের প্রশিক্ষণের বিষয়টিতে কেবল সংশ্লিষ্ট বিচারকের প্রাপ্ত সুবিধার সঙ্গে তুলনা না করে একে রাষ্ট্রের জনগণের স্বার্থের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে চিন্তা করতে হবে।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:**

১. বিচারকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বর্তমান ব্যবস্থার উন্নয়ন:
ক্রমবর্ধমান মামলার চাপ মোকাবেলা এবং সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিচারক, স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিসের সদস্য, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রমে ভূমিকা পালনকারী বিভিন্ন কর্মকর্তা ও অন্যান্য ব্যক্তি এবং আদালত ও অ্যাটর্নি সার্ভিসের সহায়ক কর্মচারিদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দানের জন্য 'বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' এর ভৌত অবকাঠামো, জনবল ও প্রশিক্ষণের আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. জাতীয় জুডিসিয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. আঞ্চলিক জুডিসিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।

৪. বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৫. বিচারকগণের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

৬. স্বতন্ত্র 'পলিসি রিসার্চ ও রিফর্ম ম্যানেজমেন্ট ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়: আইনপেশার সংস্কার

১. ভূমিকা: আইনজীবীরা একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংবিধানের ৩৩(১) অনুচ্ছেদের গ্রেফতার ও আটক সংক্রান্ত বিধানে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত ৯৫(২) অনুচ্ছেদে এবং বিচার পদ্ধতি সংক্রান্ত নানাবিধ আইনে আইন পেশার স্বীকৃতির প্রতিফলন দেখা যায়। সুতরাং, বিচার বিভাগ বিষয়ক যে কোনো সংস্কার প্রচেষ্টায় আইনজীবীদের প্রসঙ্গটি অপরিহার্য। তবে, নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে এই প্রতিবেদনে মূলত তিনটি বিষয়ের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে, যথা: আইনজীবী হিসাবে সনদ প্রাপ্তি, প্রশিক্ষণ এবং বিচার কার্যক্রমে তাদের আচরণ।

২. সনদপ্রাপ্তির বর্তমান পদ্ধতি

২.১ নাগরিকত্ব বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা: Bangladesh Legal Practitioner and Bar Council Order 1972 এর অনুচ্ছেদ ২৭ অনুযায়ী একজন ব্যক্তিকে আইনজীবী অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য শর্তাবলি হলো: (ক) তাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে; (খ) তাকে ২১ বছর বয়সী হতে হবে; (গ) বাংলাদেশে স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হতে অথবা বার কাউন্সিল স্বীকৃত বাংলাদেশের বাইরের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হতে তার আইনের ডিগ্রি থাকতে হবে অথবা তাকে ব্যারিস্টার-এট-ল' হতে হবে। বাংলাদেশে এলএলবি পাশ করার পর একজন ব্যক্তি শিক্ষানবিশ হওয়ার যোগ্য হন। তাকে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন প্র্যাকটিসিং অ্যাডভোকেটের অধীনে পিউপিলেজ চুক্তি সম্পাদনক্রমে ছয় মাসের জন্য শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজ করতে হয়।

২.২ আইনজীবী অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষা

২.২.১ পরীক্ষার সিলেবাস: বর্তমানে মোট ৭টি বিষয়ের ওপর আইনজীবী তালিকাভুক্তির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এগুলো হলো: ১. দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮; ২. দণ্ডবিধি, ১৮৬০; ৩. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮; ৪. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭; ৫. তামাদি আইন, ১৯০৮; ৬. সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এবং ৭. বার কাউন্সিল অর্ডার এন্ড রুলস, ১৯৭২।

২.২.২ পরীক্ষা পদ্ধতি: আইনজীবী অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষার মোট তিনটি ধাপ রয়েছে: (ক) বহু-নির্বাচনি (এমসিকিউ) (খ) লিখিত পরীক্ষা (গ) মৌখিক পরীক্ষা। অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষার প্রার্থীদের প্রথমেই ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষা নেওয়া হয়। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা এরপর ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেয়। এমসিকিউ এবং লিখিত দুইটি পরীক্ষাতেই পাস নম্বর ৫০। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা পরবর্তীতে ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেয় যার পাশ নম্বর ২৫। মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমেই একজন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে আইনজীবী হিসেবে সনদপ্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলে গণ্য হন।

৩. বাংলাদেশে আইনজীবীগণের যোগ্যতা এবং সনদপ্রাপ্তিতে বিদ্যমান সমস্যা

৩.১ সংক্ষিপ্ত সিলেবাস: বর্তমানে বার কাউন্সিল পরীক্ষার সীমাবদ্ধ সিলেবাস দেশের পরিবর্তনশীল আইনগত প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দেশে আইন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, এবং নতুন নতুন আইনগত চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। বার কাউন্সিলের বর্তমান সিলেবাসে এসব পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা যায় না। এর ফলে প্রার্থীরা শুধু পুরোনো আইনি ধারণাগুলোর উপর নির্ভরশীল থেকে যান, যা তাদের ভবিষ্যত পেশাগত জীবনে সমস্যার সৃষ্টি করে। বর্তমানে মাত্র ৭টি আইন বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়।

৩.২ বিলম্বিত অর্ন্তভুক্তি পরীক্ষা: বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় বারবার বিলম্ব একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা আইনপেশার প্রার্থীদের নানা আর্থিক, মানসিক এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন করছে। বাংলাদেশে বার কাউন্সিল পরীক্ষার মাধ্যমে আইনজীবীদের তালিকাভুক্তির জন্য বার কাউন্সিল অর্ডার, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১১(খ) এর মাধ্যমে ৫-সদস্য বিশিষ্ট তালিকাভুক্তি কমিটি গঠন করা হয়। আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি, হাইকোর্ট বিভাগের দুইজন বিচারপতি , বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল এবং বার কাউন্সিলের একজন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে তালিকাভুক্তি কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। বাস্তবতা হচ্ছে কমিটির বিচারপতি সদস্যরা স্বাভাবিকভাবেই বিশাল সংখ্যক মামলার বিচারিক কার্যক্রমের চাপে ভারাক্রান্ত থাকেন। এছাড়া রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেলের পক্ষে তাঁর নির্ধারিত দায়িত্বের বাইরে গিয়ে তালিকাভুক্তি

কমিটির কার্যাবলি যথাযথভাবে সম্পাদন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। যার ফলে বার কাউন্সিল পরীক্ষা গ্রহণে বিলম্ব বেড়েই চলেছে যা আইনপেশায় যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীদের জন্য চরম হতাশাজনক একটি বিষয়।

৩.৩ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের অভাব

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক আইনজীবীদের জন্য এখনো কোনো পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নেই। কিন্তু আইনজীবীদের আইন বিষয়ক জ্ঞান ছাড়াও মামলার কৌশল, আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা, ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট, এবং পেশাগত আচরণ সম্পর্কে দক্ষতা লাভের জন্য বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। বাংলাদেশে আইনজীবী অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তত ছয় মাসব্যাপী শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা চাওয়া হলেও বাস্তবে এই শিক্ষানবীশীর তেমন কার্যকারিতা দেখা যায় না।

৪. পেশাগত শৃঙ্খলা ও বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের ভূমিকা

আইনজীবীদের পেশাগত শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল এই বিষয়ে নজরদারি করার জন্য গঠিত হলেও, এর কার্যকারিতা এবং আইনজীবীদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব আইন পেশার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করছে। পেশাগত নৈতিকতা বিষয়ক বিধি থাকলেও, তাদের প্রয়োগে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আইনজীবীদের পেশাগত সংস্কার এবং বার কাউন্সিলের কার্যক্রমের উন্নয়ন করা জরুরি।

৫. পেশাগত শৃঙ্খলার গুরুত্ব

স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং কার্যকর বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আইনজীবীদের পেশাগত শৃঙ্খলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বাস্তবতা এই যে, পেশাগত মান রক্ষায় ও আচরণগত বিষয়ে কার্যত রয়েছে অনেক আইনজীবীর মধ্যেই রয়েছে অবহেলা। যেসব কর্মকাণ্ডে এর বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে: (১) মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রিতা; (২) বিচারকের সাথে অপেশাদার অচরণ; (৩) মামলা পরিচালনায় অবহেলা; (৪) মক্কেলের অনুরোধ সত্ত্বেও অনাপত্তিপত্র (NOC) প্রদান না করা; (৫) আইনজীবী সমিতিগুলোতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার; (৬) কোনো মামলায় কোনো আইনজীবী ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকলে তাঁর বিপক্ষে অন্য আইনজীবীর নিয়োগে বাধাপ্রদান এবং আদালত বর্জন; (৭) মিথ্যা মামলাকে নিরুৎসাহিত না করা; (৮) টিআইবি রিপোর্ট অনুসারে বিচার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডে কতিপয় আইনজীবীর অংশগ্রহণ; (৯) মামলার ফি গ্রহণে রশিদ না দেয়া; ইত্যাদি।

বাংলাদেশে আইনজীবীদের মধ্যে মক্কেলের কাছ থেকে মামলার ফি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো লিখিত রেকর্ড রাখার প্রবণতা খুব কম লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে মক্কেল এবং আইনজীবীর মধ্যে আর্থিক বিরোধ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এছাড়া ফি গ্রহণের রশিদ না থাকার ফলে মামলার কোনো পর্যায়ে মক্কেল কত ফি দিয়েছেন তা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ থাকে । রেকর্ড না থাকায় এই ধরনের অভিযোগ প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অধিকন্তু, ফি গ্রহণে কোনো লিখিত রেকর্ড না থাকা আয়কর আইনের বিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ।

৬. অন্যান্য সমস্যা:

(ক) ট্রাইবুনাল কর্তুক অভিযোগ নিষ্পত্তির পরিস্থিতি অসন্তোষজনক। বার কাউন্সিল প্রদত্ত তথ্য অনুসারে দেখা যায় ২০২০-২০২৪ সালে দায়েরকৃত অভিযোগের সংখ্যা ৪০১ টি এবং নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ৪০ টি;

(খ) ১৯৭২ সালের বার কাউন্সিল অর্ডার কিংবা বার কাউন্সিল বিধিতে আইনজীবীদের পেশাগত অসদাচরণের কোনো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া নেই। ২০২৩ সালে সুপ্রীম কোর্টের একটি রায়েও বার কাউন্সিল আদেশে আইনজীবীদের পেশাগত অসাদাচরণের সংজ্ঞা না থাকা এবং যথাযথভাবে এর সংজ্ঞা নিরূপণের গুরুত্বের বিষয়টি উঠে আসে;

(গ) বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের তিনজন সদস্যের সবাই আইনজীবী হওয়ায় ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা বেড়ে যায়;

(ঘ) বার কাউন্সিল আদেশ কিংবা বিধিতে অভিযোগের তদন্তের জন্য কোনো নির্দিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা বা সংস্থার উল্লেখ নেই। ফলে, অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় মাঠ পর্যায়ের তদন্তের সুযোগ সীমিত;

(ঙ) আইনজীবীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে অনধিক ৫০০ টাকা জরিমানার বিধান অত্যন্ত অপ্রতুল।

৭. সুপারিশকৃত পদক্ষেপঃ

(ক) প্রচলিত মামলার ধরন বিবেচনায় সনদপ্রাপ্তির পরীক্ষার সিলেবাসে আরো কিছু আইন, যেমনঃ পারিবারিক আইন, অর্থঋণ আদালত আইন, নেগোসিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্ট, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, শ্রম আইন, ইত্যাদি সংযোজন করা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামো, মৌলিক অধিকার সম্পর্কে আইনজীবীদের সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য সাংবিধানিক আইনকে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

(খ) আইনজীবীদের পেশাগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা আবশ্যক। এর মাধ্যমে, আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্তির পর প্রথম ছয় মাসে আর্থ-সামাজিক ও পেশাগত বাস্তবতার নিরিখে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

(গ) আইনজীবীদের পেশাগত বিধিমালা Canons of Professional Conduct and Etiquette কে যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। উক্ত বিধিমালায় বর্তমানে আইন পেশায় বিদ্যমান শৃঙ্খলাজনিত সমস্যাবলিকে বিবেচনায় নিয়ে নতুন বিধি সংযোজন করতে হবে। এছাড়া এই পেশাগত বিধিমালার যথাযথ প্রয়োগে গুরুত্বারোপ করতে হবে। ।

(ঘ) বার কাউন্সিল আদেশে আইনজীবীদের পেশাগত অসদাচরণের একটি স্পষ্ট সংজ্ঞা থাকতে হবে। উক্ত সংজ্ঞায় আইনজীবীর পেশাগত দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত বা গুরুতর অবহেলা, অসততা, দুর্নীতি, মক্কেলের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ, আইন লংঘনের পরামর্শ, আদালতের প্রতি অসম্মান, সহকর্মীদের প্রতি অসদাচরণ, এবং বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত Canons of Professional Conduct and Etiquette এর নির্দেশনা ভঙ্গের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।।

(ঙ) আইনজীবীদের সংখ্যা এবং দাখিলকৃত অভিযোগের সংখ্যা বিবেচনা করে অবিলম্বে ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। ঢাকায় স্থায়ীভাবে ৫টি ট্রাইব্যুনাল এবং ঢাকার বাইরে প্রতিটি জেলায় একটি করে ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা প্রয়োজন, যাতে আইনজীবী এবং অভিযোগকারী তাদের নিজ জেলার ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের এবং পরিচালনা করতে পারেন।ট্রাইব্যুনালের গঠন সংশোধন করা উচিত যাতে এর প্রধান হিসাবে একজন বিচারক দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং অন্য দুইজন সদস্য আইনজীবীগণের মধ্য থেকে নিযুক্ত হন।

(চ) আদালতে এজলাস কক্ষের পাশাপাশি, সেরেস্তা, নেজারতখানা, রেকর্ডরুম, নকলখানা এবং আদালতের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যথেষ্ট সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে। সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের পাশাপাশি সেগুলোর যথাযথ পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এর ফলে নিরাপত্তা প্রক্রিয়ার সাথে সাথে আইনজীবী এবং অন্যান্যদের অসদাচরণের অভিযোগের তদন্ত সুষ্ঠু ও কার্যকর হবে।

(ছ) আইনজীবীর ফি নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং একটি লিখিত চুক্তি থাকা আবশ্যক। এই চুক্তি অনুযায়ী প্রতিবার ফি পরিশোধের পর আইনজীবীর মক্কেলকে একটি রসিদ প্রদান করবেন। উক্ত রসিদে ফি পরিশোধের তারিখ, পরিশোধিত ফি'র পরিমাণ, কোন মামলার জন্য ফি পরিশোধ করা হয়েছে তার বিবরণ এবং আইনজীবীর স্বাক্ষর থাকতে হবে।

(জ) আইনজীবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বা হয়রানিমূলক অভিযোগ দায়েরের কারণে আইনজীবীর ব্যক্তিগত এবং পেশাগত ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনায় নিয়ে জরিমানার বিধান যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

(ঝ) আইনজীবী সমিতিগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে। বিচারিক প্রক্রিয়াকে নিরপেক্ষ, স্বাধীন এবং গতিশীল রাখার জন্য আদালত প্রাঙ্গণে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করতে হবে।

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়: আইন শিক্ষার সংস্কার

১. ভূমিকা: বর্তমানে বাংলাদেশে আইন শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন দেখভাল করার জন্য একক কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এবং আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকটা সমন্বয়হীনভাবে আইন শিক্ষা পরিচালনা করে থাকে। আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইন বিভাগ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইন বিভাগ এবং আইন কলেজ। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৮২টি আইন কলেজ প্রাতিষ্ঠানিকি ভাবে আইন স্নাতক (সম্মান) ও পাস ডিগ্রি প্রদান করছে। এই তিন ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদত্ত আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যাপূর্ণ ক্ষেত্র বিভিন্ন গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

- সমন্বয়হীন পাঠ্যসূচি;
- আইন শিক্ষার জন্য যোগ্য শিক্ষার্থী বাছাই;
- আইন শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকে উৎসাহিত না করে চাপিয়ে দেওয়া;
- আইন শিক্ষায় ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব।

এসব সমস্যা লাঘবের জন্য বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন নিম্নরূপ প্রস্তাব করছে:

২. সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:

২.১ আইন শিক্ষা বোর্ড: আইন শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন দেখভালের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র আইন শিক্ষা বোর্ড থাকা উচিত। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে উক্ত বোর্ড আইন শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। উক্ত আইন শিক্ষা বোর্ডের গঠন নিম্নরূপ হতে পারে:

১.	জেলা আদালতের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক	চেয়ারম্যান
২.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আইনের অধ্যাপক	সদস্য
৬.	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আইনের অধ্যাপক	সদস্য

২.২ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন (সম্মান) কোর্সে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা: আইন শিক্ষা বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আইন (সম্মান) কোর্সে ভর্তি এবং ভর্তি পরীক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন করে এক বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ভর্তি পরীক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করবে। উক্ত নীতিমালায় যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদনের যোগ্যতা
- ভর্তির জন্য প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া
- মেধা তালিকা প্রকাশ: ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মধ্য থেকে সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন (সম্মান) কোর্সে ভর্তির জন্য জাতীয় মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সর্বনিম্ন নম্বর নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত হবে।

- কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদিত আসনের অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। অনুমোদিত আসনের অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান থাকবে।

অনুরূপভাবে, আইন শিক্ষা বোর্ড ল কলেজগুলোতে ভর্তির সমন্বিত একটি পদ্ধতি প্রচলনের ব্যবস্থা করবে যাতে ভর্তিচ্ছুদের ন্যূনতম মান বজায় রাখা যায়।

২.৩ পাঠ্যসূচি আধুনিকায়ন: অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সিলেবাস অত্যন্ত ব্যাপক। এ ধরনের সিলেবাস শিক্ষার্থীদের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতিরিক্ত জিইডি কোর্সের বাইরেও অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ আইন বিষয়ক কোর্স পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অতিরিক্ত কোর্সের চাপে শিক্ষার্থীরা আইন বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। আইন শিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কোর্সের চাপ কমাতে হবে।

আইন শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটির উপর আরো বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কোর্ট ভিজিট, মুটিং, ল ক্লিনিকের পাশাপাশি গবেষণার উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। কম্যুনিটি লিগ্যাল সার্ভিস, সমসাময়িক আইনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যলয়ের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের মতবিনিময় সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ নিয়মিত আয়োজন করা উচিত।

স্নাতক পর্যায়ে আইন শিক্ষায় আধুনিক কিছু কোর্স পড়ানো উচিত, যেমন: সাইবার আইন, ফরেনসিক ও বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য, আদালত ও মামলা ব্যবস্থাপনা, লিগ্যাল ও প্রফেশনাল এথিকস এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি।

২.৪ আইন শিক্ষার মাধ্যম: বাংলাদেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগগুলোতে ছাত্রদের পরীক্ষায় ইংরেজিতে উত্তর দিতে বাধ্য করা হয়। এতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এবং আইন শিক্ষার মান কমছে। আইন শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকে উৎসাহিত করা যেতে পারে, কিন্তু বাধ্য করা উচিত নয়।

২.৫ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে আইন শিক্ষা: মৌলিক মানবাধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা, আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা এবং সর্বোপরি আইন ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মনে প্রোথিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মাধ্যমিক শ্রেণিতে বিভিন্ন বিষয়ে আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে আইন একটি পূর্ণ বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়: মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রতিরোধ

১. ভূমিকা: বাংলাদেশের আইন অঙ্গনে মিথ্যা মামলা দায়ের এবং সেগুলোর কারণে আসামিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের ভোগান্তি একটি নৈমিত্তিক বিষয়। এই বিষয়টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে এ ধরনের মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বিভিন্ন আইনের অপব্যবহার এবং অপপ্রয়োগের ঘটনাও কম নয়। বস্তুত: বাংলাদেশের বাস্তবতা এই যে, দেওয়ানী বা ফৌজদারি প্রায় সব ধরনের মামলাতেই কিছু না কিছু মিথ্যা তথ্য, মিথ্যা দাবি, অতিরঞ্জন এবং অনুদঘাটিত সত্য থাকে। মিথ্যা মামলার বিষয়ে দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধিসহ বিভিন্ন বিশেষ আইনে দণ্ড আরোপ এবং মামলা দায়েরের পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধান থাকা সত্ত্বেও এসব বিধান প্রয়োগ করা হয় না বললেই চলে। বলা বাহুল্য শেষ পর্যন্ত এর দায়ভার চাপানো হয় বিচার বিভাগের ওপর। সুতরাং, বিচার ব্যবস্থার কার্যকরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিগত দিনের এবং বর্তমানে বিরাজমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিষয়টি সম্পর্কে জরুরি ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া সমীচীন।

২. বিদ্যমান বিভিন্ন আইনে মিথ্যা মামলার শাস্তি

মিথ্যা মামলা সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনগুলোর সংক্ষিপ্তসার নিচের টেবিলে দেয়া হলো:

আইনের নাম	সংশ্লিষ্ট ধারা	শাস্তি	কে মামলা দায়ের করতে পারে
The Penal Code, 1860	২১১	Imprisonment for two to seven years and fine.	শুধু মাত্র ম্যাজিস্ট্রেট বা আপীল আদালত
	২০৩	Imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.	
	২০৯	Imprisonment of either description for a term which may extend to two years, and shall also be liable to fine.	
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০	১৭	অনধিক সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড	যে কোনো ব্যক্তি
এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২	৪০	অনূর্ধ্ব সাত বৎসর ও অন্যূন দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য
এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২	৮	অনধিক সাত বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদণ্ড।	যে কোনো ব্যক্তি
আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২	৬	অন্যুন দুই বৎসর এবং অনধিক পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪	২৮গ	অন্যূন ২ (দুই) বৎসর বা অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য
পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০	৩২	অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য
মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২	১৫	অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং অন্যূন ২ (দুই) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড।	কোনো লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বা আদালত নিজে
পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২	১৩	সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য
বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২	৪২	সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য

আইনের নাম	সংশ্লিষ্ট ধারা	শাস্তি	কে মামলা দায়ের করতে পারে
ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫	২৬	অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড, তবে ৩ (তিন) মাসের নিচে নয়, বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, তবে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার নিচে নয়, বা উভয় দণ্ড।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই।
বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭	৪৪	সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পযন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য
বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭	৬	অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ড।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য
যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮	৬	অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।।	কে মামলা দায়ের করবেন তা আইনে উল্লেখ নেই। ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য
সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩	৩৪	মূল অপরাধটির জন্য যে দণ্ড নির্ধারিত রয়েছে সেই দণ্ড।	যে কোনো ব্যক্তি
The Code of Criminal Procedure, 1898	250	Compensation to such amount not exceeding one thousand Taka or, if the Magistrate is a Magistrate of the third Class, not exceeding five hundred Taka, as he may determine be paid by such complainant or informant to the accused or to each or any of them. Also suffer imprisonment for a period not exceeding six months or pay a fine not exceeding three thousand Taka.	Magistrate himself

৩. বিদ্যমান আইনগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য

বিদ্যমান আইনগুলো পরীক্ষা করে দেখা যায় যে মামলা দায়েরের পদ্ধতি এবং আরোপযোগ্য দণ্ডের বিষয়ে বিভিন্ন আইনে বিভিন্ন রকম বিধান রয়েছে। এসবের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

(ক) দণ্ডবিধির ২০৩ এবং ২১১ ধারায় এর ভিত্তিতে কোন মামলা দায়ের করার এখতিয়ার শুধুমাত্র ম্যাজিস্ট্রেট অথবা আপিল আদালতের।

(খ) কয়েকটি বিশেষ আইন (Special Law) যেমন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ অনুসারে মিথ্যা মামলা দায়ের এর বিষয়ে মূল মামলার (মিথ্যা মামলার) যে কোনো আসামি মামলার সূচনা করতে পারবে।

(গ) আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষায়িত আইনে মিথ্যা মামলা দায়েরের বিরুদ্ধে কে মামলা করতে পারবে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। কিন্তু মিথ্যা মামলা দায়েরের জন্য শাস্তির বিধান আছে।

(ঘ) বেশ কিছু আইনে মিথ্যা মামলার শাস্তির বিধান আছে কিন্তু মামলাটি সম্পূর্ণ বা আংশিক মিথ্যা কি না সে বিষয়ে বিচারিক আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই। আবার এসব আইনে এরূপ ব্যাখ্যাও নাই যে কোনো মামলা আদালতে প্রমাণিত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, অভিযোগকৃত ঘটনা ঘটেনি।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:**

বর্ণিত পরিস্থিতিতে মিথ্যা মামলা দায়ের বিষয়ে নতুনভাবে একটি সাধারণ আইন তৈরি করা অথবা বিদ্যমান ১৫-১৬ টি আইন আলাদাভাবে সংশোধন করা জটিল ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নরূপ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে :

(ক) মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রতিরোধ বিষয়ে একটি বাস্তবানুগ আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে নিবিড় ও ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(খ) ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারার অনুরূপ একটি বিধান উক্ত কার্যবিধির ২৩ অধ্যায়ে (দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার) সন্নিবেশিত করতে হবে।

(গ) ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারায় উল্লিখিত জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

(ঘ) মিথ্যা মামলা বিষয়ে এই মর্মে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যামূলক বিধান যোগ করতে হবে যে কোন মামলা প্রমাণিত না হওয়া অর্থ এই নয় যে মামলাটি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা।

(ঙ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশের প্রতি এ মর্মে নির্দেশনা প্রদান করতে পারে যে, মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা বলে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ থাকলে (বিশেষতঃ এজাহারে অস্বাভাবিক সংখ্যক অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম থাকলে), অপরাধ সংঘটনে কোনো আসামীর সুনির্দিষ্ট কোনো ভূমিকার উল্লেখ এজাহারে না থাকলে সেই আসামীকে গ্রেফতার করা হবে না।

(ছ) আইন মন্ত্রণালয় পাবলিক প্রসিকিউটরদের প্রতি এ মর্মে নির্দেশনা প্রদান করতে পারে যে মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা বলে সন্দেহ করা যায় এরূপ মামলায় কোনো আসামী পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হলে পাবলিক প্রসিকিউটর বা ক্ষেত্রমত, কোর্ট ইন্সপেক্টর বা কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টর, আদালতে ওই আসামীর জামিনের বিরোধীতা করবে না।

(জ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টকে এই মর্মে হাইকোর্ট ডিভিশন রুলসের Chapter-IIIB এর অধীনে প্র্যাকটিস ডাইরেকশন জারি করার অনুরোধ করা যেতে পারে যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ২০০ ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে কোনো অভিযোগ আনয়ন করা হলে এবং উক্ত অভিযোগে উল্লিখিত আসামীদের অধিকাংশের অভিযোগকৃত ঘটনার সাথে সুস্পষ্ট সংশ্লিষ্টতা না থাকলে পুলিশ বা অন্যকোনো ব্যক্তি কর্তৃক যথাযথভাবে অভিযোগটির তদন্ত সম্পন্ন না করে বা ক্ষেত্রমত, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অনুসন্ধান সম্পন্ন না করে, কোনো অপরাধ সরাসরি আমলে গ্রহণ করা যাবে না।

(ঝ) বাংলাদেশ বার কাউন্সিল প্রতিটি বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে সকল আইনজীবীকে এ মর্মে সতর্ক করে পরিপত্র জারি করবে যে, কোন আইনজীবী বিচারিক কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে (যেমন, ফৌজদারি কার্যবিধির ২০০ ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেট কোন কার্যধারা গ্রহণ করলে বা জামিনের আবেদন মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করলে আদালতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, ম্যাজিস্ট্রেটকে হুমকি দেওয়া বা তার ওপর চাপ সৃষ্টি করা, ইত্যাদি) তার বিরুদ্ধে পেশাগত আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে কার্যধারা সূচনা করা হবে।

(ঞ) ইতোমধ্যে যে সব মামলা পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দায়ের হয়েছে এবং তদন্তাধীন আছে সেগুলোর তদন্ত যাতে দ্রুত সম্পন্ন করে নিরাপরাধ ব্যক্তিদের ব্যাপারে ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান করা হয় বা চার্জশীটে তাদের অব্যাহতি দেওয়ার (নট সেন্ট আপ) আবেদন করা হয়, সে জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান। এক্ষেত্রে আইন মন্ত্রণালয়ও সরকারি কৌশুলিদের ইতিবাচক ভূমিকা রাখার জন্য নির্দেশনা দিতে পারে।

(ট) উল্লিখিত (ঞ) দফার কার্যক্রম তদারকির জন্য প্রতি বিভাগে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে যাতে করে কোনো প্রকৃত অপরাধী পুলিশের সাথে যোগ-সাজশের মাধ্যমে মামলা থেকে অব্যাহতি না পায়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়: বিচারহীনতার সংস্কৃতি

১. ভূমিকা: বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন গঠনের প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত দায়িত্বের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন প্রায় ৪৩ লক্ষ মামলা গ্রহণযোগ্য মান বজায় রেখে দ্রুত নিষ্পত্তি এবং ভবিষ্যতে একটি নিরপেক্ষ ও কার্যকর বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ প্রণয়ন। এসব মামলার সংখ্যা, ধরন ও নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের কারণ। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, প্রচলিত বিচার কার্যক্রম বহির্ভূত নানাবিধ অপরাধ এবং আইন লংঘনের সংখ্যা বিচারাধীন মামলার চাইতে অনেক গুণ বেশি। ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায্যতার শাস্তি ও প্রতিকার বিধান যদি হয় ন্যায় বিচারের মূলমন্ত্র, তাহলে বিচার বিভাগ সংস্কারের ক্ষেত্রে কোনো ভাবেই ঐসব ঘটনাকে উপেক্ষা করা সমীচীন নয়।

২. বিচারহীনতার বর্তমান চিত্র: বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং নির্বাচনে বহুমাত্রিক অনাচারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের মতো ঘটনা ব্যাপকভাবে আলোচিত। কিন্তু এর বাইরেও প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত বা প্রকাশিত অসংখ্য ঘটনা যেগুলো বিচারিক কার্যক্রমের আওতায় আসে না। এসব ঘটনা থেকে গেছে বিচার কার্যক্রমের বাইরে, সৃষ্টি হয়েছে এক ধরনের বিচারহীনতার সংস্কৃতি। ব্যক্তি পর্যায়ের অপরাধ ছাড়াও প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে সামগ্রিকভাবে জন-মানুষের জীবন বিধ্বংসী নানা ধরনের পরিবেশ দূষণকারী অপরাধ। মানুষের স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নকারী ট্রাফিক আইনের লংঘন। এটা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের এক বহুল পরিচিত অথচ অবহেলিত বাস্তবতা। সেদিকে রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্ণধারদের নজরও তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় না। তাই নির্দ্বিধায় বলা চলে এভাবে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারহীনতার সংস্কৃতি সমাজে পেয়েছে এক ধরনের সহনীয়তা।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বিচারহীনতার কয়েকটি সর্বজনবিদিত উদাহরণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক) ক্ষমতাসীনদের লালিত, পালিত ও সমর্থিত নানা ধরনের সন্ত্রাসী বাহিনীর অবৈধ কর্মকাণ্ড;
খ) ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় প্রতিদিন সংঘটিত চাঁদাবাজি;
গ) প্রায় সব সরকারি-আধাসরকারি-স্বায়ত্তশাসিত অফিসে সেবা গ্রহণে ছোট-বড় ঘুষের ঘটনা ও তথাকথিত 'স্পীড মানি' প্রথা;
ঘ) আদালত অঙ্গনে ঘুষসহ নানাবিধ অনিয়ম;
ঙ) বিদেশে নানা ধরনের কর্মী প্রেরণে প্রতারণা;
চ) প্রায় সকল সরকারি-আধাসরকারি-স্বায়ত্তশাসিত অফিসে জনবল নিয়োগে সীমাহীন দুর্নীতি;
ছ) প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ভূমিদস্যুতা বা জবর-দখল;
জ) সড়ক দুর্ঘটনায় হাজার হাজার আহত-নিহত মানুষের আর্তনাদ;
ঝ) প্রতিনিয়ত ট্রাফিক আইনের লংঘন;
ঞ) আইন থাকা সত্ত্বেও বহুতল ভবন নির্মাণে নিয়োজিত অগনিত শ্রমিকের মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব;
ট) রাস্তাঘাটে প্রতিদিন নারীদের শ্লীলতাহানি ও আনুষঙ্গিক অপরাধ;
ঠ) পরিবারে সংঘটিত কিন্তু অপ্রকাশিত ছোট-বড় নানা ধরনের নির্যাতন;
ড) পরিবেশ সংক্রান্ত আইনের লংঘন;
ঢ) আইন থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ বাবা-মা এর অবহেলিত ও করুণ জীবন যাপন;
ণ) চিকিৎসা সেবা ও আইনী/ বিচারিক সেবা প্রাপ্তিতে মাত্রাতিরিক্ত অর্থব্যয় ও সময়ক্ষেপন;
ত) শিক্ষাদানের নামে প্রতারনার মাধ্যমে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানে, বিশেষত আইন শিক্ষায়, প্রতি বছর হাজার হাজার ডিগ্রিধারী বেকার সৃষ্টি, ইত্যাদি।

৩. বিচারহীনতার এই সংস্কৃতি থেকে বের হওয়ার উপায়: একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বিচারহীনতার সব ধরনের সংস্কৃতি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। দীর্ঘদিনের অবহেলা বা উপেক্ষার কারণে যেসব বিষয় অপরাধ হিসেবে সাধারণত গণ্যই করা হয় না অথচ যার মাধ্যমে একজন মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হয়, এসব বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি ব্যাপক জনসচেতনতা

সৃষ্টি। আগে যে বিষয়টিকে মানুষ অপরাধ বলে মনে করত না, জনসচেতনতা সৃষ্টির কারণে আস্তে আস্তে সেটাকে সে আইনের লংঘন বলে ভাবতে শুরু করবে। যখন কোন কাজ অন্যায়ভাবে করা হচ্ছে বলে মানুষ ভাবতে শুরু করে সাধারণত তখন সে ওই কাজটি দ্বিতীয়বার করতে দ্বিধাবোধ করে এবং পরবর্তীকালে বাধ্য না হলে সেই অন্যায় কাজটি করে না।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:**

১. উপরের ২ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ১৬ টি উপেক্ষিত অপরাধসহ উপেক্ষিত অন্যান্য অপরাধ সম্পর্কে, **প্রথমত**, জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে; **দ্বিতীয়ত**, আইন ভঙ্গকারীকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আচরণ শোধরানোর জন্য সময় দিতে হবে; এবং **তৃতীয়ত**, আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ থেকে ধীরে ধীরে এসমস্ত অপরাধ দূরীভূত করতে হবে।

২. এ অপরাধগুলো যেন সংঘটন না করা হয় সে সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শেখাতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে এ সমস্ত বিষয়কেন্দ্রিক গল্প বা উপদেশমূলক প্রবন্ধ পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. উপেক্ষিত অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যক্তি আদালতে অভিযোগ দায়েরের জন্য হাজির নাও হয়, এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটগণ এই সমস্ত অপরাধ ঘটতে দেখলে সাথে সাথে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯০(১)(গ) ধারার অধীনে নিচের প্রস্তাবিত ফরমে অপরাধ আমলে গ্রহণ করে বিচারের জন্য এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে প্রেরণ করবেন।

৪. উপেক্ষিত অপরাধগুলোকে ফৌজদারি কার্যবিধির ২০৬ ধারায় বর্ণিত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের আওতায় আনতে হবে এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

প্রস্তাবিত ফরম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

.....ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

.....(জেলার নাম)

ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯০(১)(গ) ধারার বিধান অনুসারে অপরাধ আমলে গ্রহণ করার ফরম

অপরাধ সংঘটনের স্থান:	
অপরাধ সংঘটনের তারিখ ও সময়:	
সংঘটিত অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:	
যে আইন ও আইনের যে ধারার অধীনে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার বিবরণ:	
যাদের বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নেওয়া হলো তাদের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা ও আইনের যে ধারায় অপরাধ আমলে নেওয়া হয়েছে তার বিবরণ: (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করুন)	
অপরাধ আমলে গ্রহণের তারিখ:	
অপরাধ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সাক্ষীদের নাম ও ঠিকানা:	

আমি (নাম).....পদবী (কোন শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট উল্লেখ করুন) .....,
জেলা/মহানগর..... ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯০(১)(গ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আসামীদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ধারায় অপরাধ আমলে গ্রহণ করলাম।

সীল মোহর, স্বাক্ষর ও তারিখ

ঊনত্রিংশ অধ্যায়: বিচারাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ

১. ভূমিকা: বিচার বিভাগ সংবিধানে স্বীকৃত রাষ্ট্রের মূল স্তম্ভগুলোর একটি, এবং সংবিধান হলো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রণীত একটি দলিল। তাছাড়া, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট অনেক বিরোধ, যেমন, মৌলিক অধিকারের প্রয়োগ, আইনের সাংবিধানিকতার প্রশ্ন, নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ, ইত্যাদিও বিচার বিভাগের কার্যক্রমের বিষয়বস্তু। সুতরাং, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ডের ফলাফল থেকে একটি দেশের বিচার বিভাগ কখনোই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। আবার, বিচার বিভাগের ভূমিকা যথার্থভাবে পালন করার ক্ষেত্রে যে মৌলিক শর্তগুলো নিশ্চিত করতে হয়, তার মধ্যে প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি পর্যায়ে বিচারকদের নিরপেক্ষতা অপরিহার্য। সুতরাং, বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার কোনো বিকল্প নেই। এসব মৌলিক নীতির প্রয়োগিক অর্থ হলো, মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বা বিচার বিভাগের সার্বিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপ বা প্রভাব বা বিবেচনা থেকে মুক্ত থাকা। সংবিধানের ২২, ৩৫, ৯৪ ও ১১৬ক অনুচ্ছেদগুলোতে এই নীতির প্রতিফলন রয়েছে।

২. বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রভাব: যদিও সংবিধানের উপরিউক্ত বিধানগুলোতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার ঘোষণা রয়েছে, কিন্তু কার্যত সংবিধানের বিদ্যমান কাঠামোতে বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য যথাযথ বিধান অনুপস্থিত। এর ফলে, বিগত কয়েক দশকে বিচার বিভাগের রাজনীতিকরণের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিচার বিভাগকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের একটি মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের কারণে বিচারক ও আইনজীবীসহ সমগ্র সমাজকে এই প্রক্রিয়ায় ভুক্তভোগী হতে হয়েছে। বিচার বিভাগের রাজনীতিকরণের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নভাবে ঘটেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

(ক) যোগ্যতর ও কর্মে প্রবীণ বিচারককে প্রধান বিচারপতি বা আপীল বিভাগের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার পরিবর্তে রাজনৈতিক বিবেচনায় ওইসব পদে নিয়োগ; একইভাবে, অধস্তন আদালতের বিচারকদের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার পরিবর্তে রাজনৈতিক বিবেচনা প্রয়োগ;

(খ) রাজনীতি ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মামলার রায়ে ক্ষমতাসীন দলের অভিপ্রায় বাস্তবায়নের প্রয়াস, যার মধ্যে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য হলো সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলার রায়, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক মতৈক্যের ভিত্তিতে প্রবর্তিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়;

(গ) কোন কোন রায়ে অপ্রয়োজনীয় ও দৃষ্টিকটুভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য, মতামত ও বিতর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা;

(ঘ) আইনজীবীদের রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে মামলা পরিচালনায় তাদের সুবিধা প্রদানের প্রবণতা এবং মামলার ফলাফলে তার প্রতিফলন;

(ঙ) আইনজীবী সমিতিগুলোর নির্বাচনে এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ে রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ, যার নির্দশন হলো নির্বাচনের প্যানেল রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে অনুমোদনের প্রচলন;

(চ) আদালত প্রাঙ্গনে বিভিন্ন দলীয় রাজনৈতিক স্লোগানসহ মিছিল, সভা, বিক্ষোভ কর্মসূচি, ঘেরাও, বয়কট, বিচারকদের হুমকি প্রদান, ইত্যাদি।

৩. আদালত চত্বরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সর্ম্পকে রায়: আদালত প্রাঙ্গনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৫ সালে হাইকোর্ট বিভাগের দেয়া একটি স্বতপ্রণোদিত রায়ে[২৭] আদালতের প্রবেশদ্বার বা চত্বরের মধ্যে যে

[২৭] ২০০৭ (১৫)বিএলটি (এইচসিডি) ৬৬।

কোনো রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক জমায়েত, মিছিল, অবস্থান, বয়কট বা ঘেরাও কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তবে, বাস্তবে দেখা গেছে, সরকারি বা বিরোধী রাজনৈতিক দলের অনুসারী কেউই আদালতের নির্দেশ অনুসরণ করেনি। বরং, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আদালত চত্বরে রাজনৈতিক সমাবেশ, মিছিল এবং বিক্ষোভের মাত্রা উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা রাজনৈতিক আনুগত্যের পুরষ্কার হিসেবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগও পেয়েছেন।

৪. সুপারিশকৃত পদক্ষেপ

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বিচারাঙ্গনকে দলীয় রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে কমিশনের প্রস্তাব নিম্নরূপ:

(ক) রাজনৈতিক বিবেচনায় বিচারক নিয়োগের প্রচলন পরিহার করার উদ্দেশ্যে একটি স্বাধীন কমিশনের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থার প্রচলন করা অপরিহার্য[২৮];

(খ) বিচার বিভাগ, এবং বৃহত্তর অর্থে বিচারাঙ্গনকে, রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে রাজনৈতিক দলগুলোর সুস্পষ্ট অঙ্গীকার প্রয়োজন; বিশেষ করে, রাজনৈতিক দলগুলোকে অঙ্গীকার করতে হবে যে, তারা:

(অ) আইনজীবী সমিতি নির্বাচন এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখবে না বা উক্ত নির্বাচনগুলোতে অন্য কোনভাবে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার বা হস্তক্ষেপ করবে না; এবং

(আ) রাজনৈতিক দলের অঙ্গ-সংগঠন হিসাবে আইনজীবীদের কোন সংগঠনকে স্বীকৃতি দেয়া হবে না;

(গ) হাইকোর্ট বিভাগের ২০০৫ সালের রায় অনুযায়ী আদালতের প্রবেশদ্বার বা চত্বরের মধ্যে যে কোনো জমায়েত, মিছিল, বিক্ষোভ, বয়কট বা ঘেরাও কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ জারি করবে এবং তার পরিপালন তদারকি করবে;

(ঘ) বিচারকদের অবশ্যই সবধরনের রাজনৈতিক প্রভাব ও সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত থাকতে হবে; রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশকে অসদাচরণ হিসাবে বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট আচরণবিধি অনুসারে কঠোরভাবে এই ব্যাপারে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলন করা প্রয়োজন;

(ঙ) আদালতের স্বাভাবিক বিচারিক কার্যক্রম ব্যাহত করে এমন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে আইনজীবীদের বিরত থাকা আবশ্যক; আদালত প্রাঙ্গণে এই ধরনের কর্মসূচি বা কর্মকাণ্ডকে পেশাগত অসদাচরণের অন্তর্ভুক্ত করে বার কাউন্সিলের মাধ্যমে এই ব্যাপারে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলন করা এবং তার জন্য Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order 1972 এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা আবশ্যক; এবং

(চ) আদালত প্রাঙ্গনে (অর্থাৎ, আদালত ভবন ও সংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানে) মিছিল, সমাবেশ, অবস্থান, ঘেরাও কর্মসূচি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও তার কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

[২৮] তৃতীয় অধ্যায় দেখুন।

ত্রিংশ অধ্যায়: সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন

১. নৈতিকতা ও মূল্যবোধ: সামাজিক প্রেক্ষিত

নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বলতে আমরা নীতি সম্পর্কিত বোধ বা অনুভূতিকে বুঝি। মানুষ তার পরিবার সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মের ওপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি খুব সচেতনভাবে মেনে চলে। এই নিয়মগুলো মেনে চলার আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, মানসিকতা ও নীতির চর্চা করাকেই নৈতিকতা হিসেবে দেখা হয়। অন্যদিকে মানুষের আচরণকে পরিচালনা করে যেসব নীতি বা মানদণ্ড তাই মূল্যবোধ। সহজভাবে বলা যায় ভালো, মন্দ, ঠিক, বেঠিক, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের মানুষের যে ধ্যান- ধারণা তার নামই মূল্যবোধ। যেহেতু মূল্যবোধ মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায় সেহেতু মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে সমাজের উপর অনেক বিরূপ প্রভাব পড়ে, যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের পারস্পারিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

২. ক্রমবর্ধমান মামলার চাপ: সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের অনিবার্য ফল

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৩৩,৬৫৭টি। ২০২৩ সালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৫,৭০,৩৬৪ অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্টে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৬৯৫% (প্রায় ১৭গুণ)। অন্যদিকে ১৯৭৫ সালে সুপ্রীম কোর্টে বিচারকের সংখ্যা ছিল ১৭ জন, যেটি ২০২৩ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১০০ জনে। সে হিসেবে ৪৮ বছরের ব্যবধানে সুপ্রীম কোর্টে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৮৮% (প্রায় ৫ গুণ)।

২০০৮ সালে বাংলাদেশের অধস্তন সকল আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ১৪,৮৯,১২১টি। ১৫ বছর পর ২০২৩ সালে অধস্তন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৩৭,২৯,২৩৫টি। অর্থাৎ ১৫ বছরে অধস্তন আদালতে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫০% (দেড়গুণ)। অন্যদিকে ২০০৮ সালে অধস্তন আদালতে বিচারকের সংখ্যা ছিল ৭৫২ জন, ২০২৩ সালে অধস্তন আদালতে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি দাড়িয়েছে ২,০০৩ জন। সে হিসেবে ১৫ বছর পর অধস্তন আদালতে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬৫% (দেড়গুণের কিছু বেশি)।

মূলত নৈতিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের অভাব বর্তমান সমাজের ভিতরে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। পরম্পরাগত পারিবারিক সম্পর্ক বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে মূল্যবোধের অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে, এর ফলে মানুষের মধ্যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদির ব্যাপক অবনতি হয়েছে। এ কারণে মানুষ অন্যের সাথে নানাভাবে বিবাদে জড়িয়ে পড়ছে। যার পরিণতি হিসেবে সমাজে অপরাধের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হচ্ছে।

৩. মামলার সংখ্যা বৃদ্ধিতে নৈতিক অবক্ষয়ের প্রভাব

প্রথমত, নৈতিক অবক্ষয় ও উন্নত মূল্যবোধের ঘাটতির কারণে মানুষের মধ্যে আইনগত দায়িত্ব পালন না করা বা অবহেলা করা বা আইন লংঘনসহ অপরাধ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। **দ্বিতীয়ত**, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে ব্যাপক হারে মানুষের মাঝে সহনশীলতা লোপ পাচ্ছে। মানুষ অন্যের বিষয়ে খুবই অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। অধৈর্য ও অসহিষ্ণুতার কারণে অতি তুচ্ছ বিষয়েও মানুষ অন্যের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। আর এসব বিবাদ মামলায় রূপ নেয়। **তৃতীয়ত**, সমাজে নৈতিকতা ও উন্নত মূল্যবোধের চর্চা ক্রমে লোপ পাওয়ায় মানুষের মধ্যে নানা রকম নেতিবাচক প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতিবাচকতা এমনভাবে বিকশিত হচ্ছে যে, সমাজের একটি বড় অংশের মধ্যে হতাশা, ক্রোধ, ক্ষোভ, বিক্ষোভ, লোভ, চাপ ইত্যাদি তাদের জীবনাচারে পরিণত হয়েছে। মানুষের ভিতর যখন হতাশা ও নেতিবাচকতা বেড়ে যায় তখন মানুষ অতি তুচ্ছ বিষয়েও সংক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে এবং এতে অপরাধ সংঘটন করে। শেষ পর্যন্ত মামলায় রূপ নেয়। **চতুর্থত**, সমাজে নীতি নৈতিকতা বিমুখতা ও নেতিবাচকতা বৃদ্ধির কারণে সমাজের মানুষের একটি অংশের মধ্যে অপরাধমূলক মনোবৃত্তি বেড়ে গেছে। এরূপ মনোবৃত্তির ফলে মানুষ অপরাধের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কারো কারে মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করেছে যে, তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও চাতুর্য দিয়ে তারা আইন আদালতের উর্ধ্বে উঠতে

পারবে। ফলে তারা আপরাধ প্রবণ হয়ে ওঠে এবং পরিণতিতে অনেক মামলার জন্ম হয়। **পঞ্চমত,** সমাজে নীতি-নৈতিকতা ও উন্নত মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অস্থিরতা বেড়ে গেছে। অন্যের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ বেড়ে গেছে। পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরেছে। মানুষ অপরাধমুখী হয়ে পড়েছে। এর ফলশ্রুতিতে চুরি, ছিনতাই, খুন রাহাজানি, ডাকাতি প্রভৃতি নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিশোর ও যুবকদের মধ্যে মাদক, জুয়া, ক্যাসিনো, ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাঁজা, হিরোইন, পর্নোগ্রাফী, ইভটিজিং, কিশোর গ্যাং ইত্যাদির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। আর এসব নেতিবাচক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে যা শেষ পর্যন্ত মামলার সংখ্যাকে বৃদ্ধি করছে।

৪. নৈতিকতা ও উন্নত মূল্যবোধের সাথে আইন ব্যবস্থার সম্পর্ক

আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এ দুটি একে অপরের পরিপূরক। আইন ও নৈতিকতা উভয়েরই লক্ষ্য হলো মানুষকে সুন্দর ও নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা। আইনী প্রক্রিয়ায় সাক্ষ্য প্রমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু একজন প্রকৃত নীতিবান মানুষের জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ বড় কথা নয়। বরং সত্যতা ও ন্যায্যতাই প্রধান যুক্তি। তাই একজন নীতিবান ব্যক্তি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে আইন মেনে চলেন। এভাবে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা মানুষকে আইন মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করে, সহযোগিতা করে।

৫. বিচার বিভাগ সংস্কারকে ফলপ্রসু করতে দৈনন্দিন কাজকর্মে নৈতিকতা ও শুদ্ধাচারের চর্চা

দেশের সংবিধান নাগরিকের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত করলেও বিরোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রগুলো বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণভুক্ত নয় বা সেটা সম্ভব বা কাম্যও নয়। কাজেই মামলা মোকদ্দমা সৃষ্টির মূল উৎস বা ক্ষেত্রগুলো নির্মুল করতে হলে রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগ ও সেক্টরগুলোকে একযোগে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে সর্বত্র নীতি-নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার চর্চা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সেজন্য প্রয়োজন একটি বাস্তব-সম্মত কর্মপরিকল্পনা। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ নিজ নিজ কার্যপরিধি অনুসারে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সমন্বয় করবে।

৬. পরিবার ও শিক্ষা কার্যক্রমে নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার চর্চা

৬.১ পরিবারে নৈতিক শিক্ষা ও উন্নত মূল্যবোধভিত্তিক আচরণ

পরিবার হলো একটি শিশুর প্রথম শিক্ষালয়। নৈতিকতার চর্চা ও উন্নত মূল্যবোধ শিক্ষাদানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হলো পরিবার। মূলত মায়ের কোলেই শিশুর শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। কিন্তু যখন একটি শিশু দেখে তার পিতা-মাতা অনিয়ম বা অনৈতিক কিছু করছেন কিংবা নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন, তখন অবুঝ শিশুর মনে এটি দাগ কাটে। শিশু তখন তার পিতা-মাতার অন্যায়, অনৈতিক বিষয়কে সাবলীলভাবে গ্রহণ করে নেয়। এভাবে পিতা-মাতার জীবনাচার, আদর্শ ইত্যাদি তার জীবনের অংশ হয়ে উঠে। শিশুরা যাতে ভবিষ্যতে অন্যায় ও অনৈতিক পথে ধাবিত না হয় তার জন্য পরিবারকে একটি আদর্শ শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে।

৬.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষা ও উন্নত মূল্যবোধভিত্তিক আচরণের শিক্ষাদান

একজন মানবসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই শিখতে শুরু করে। শিশুর নৈতিকতা ও উন্নত মূল্যবোধের বীজ প্রোথিত হয় পরিবারে; তা বিকশিত হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আর তার চর্চা হয় সমাজে। এ কারণে পরিবারের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শিশুকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চায় অভ্যস্ত করতে হবে। আমাদের দেশে শিক্ষার স্তরবিন্যাস হলো প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা। এরমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকালই শিশুদের মানবিক চরিত্র গঠনে সর্বোচ্চ সহায়ক। কেননা, শিশুদের মধ্যে নৈতিকতার যথাযথ বিকাশ হলে তা পরিণত বয়সে যথেষ্ট কার্যকর হবে। শিক্ষকদেরও তাদের নৈতিক মান উন্নত করতে হবে। শুধুমাত্র শিক্ষাদানের মাধ্যমেই নয়, তাদের আচরণ, বক্তব্য এবং নৈতিক মান উন্নতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। একজন সৎ ও নৈতিক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য আদর্শ হতে পারেন এবং তাদের জীবনে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারেন।

৬.৩ ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে নৈতিক ও উন্নত মূল্যবোধভিত্তিক আচরণ শিক্ষাদান

ধর্ম মানুষের কল্যাণের জন্য এবং অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণের জন্য। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, শিষ্টাচার, সদাচরণ, দেশপ্রেম, বড়দের সম্মান করা, আর্তের সেবা করা, সহনশীলতা ইত্যাদি নৈতিক মূল্যবোধ

সৃষ্টিতে ধর্ম অনন্য ভূমিকা পালন করে। এসব ধর্মীয় মূল্যবোধ ব্যক্তির মানসিকতার উন্মেষ ঘটিয়ে ব্যক্তিসত্তাকে বিকশিত করে। এভাবে সমাজে সুশাসনের পথ প্রশস্ত হয় এবং নানা রকম সামাজিক অবক্ষয়ের অবসান ঘটে। সর্বস্তরের মানুষের মাঝে নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের চর্চা ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ধর্মীয় শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। মসজিদ, মন্দির, গির্জা, মক্তব ও মাদ্রাসা ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মান আরো বৃদ্ধি করার প্রতি নজর দিতে হবে।

৬.৪ শিক্ষা কারিকুলামে নৈতিক শিক্ষা ও উন্নত মূল্যবোধ ভিত্তিক আচরণ সংক্রান্ত পাঠ অন্তর্ভুক্তি

দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগসহ সর্বস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচিতে নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের চর্চা অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া নৈতিকতার চর্চার কোনো সাফল্য আসবে না। পাঠ্যক্রমের সঙ্গে নৈতিকতা শিক্ষার যোগসূত্র একজন শিক্ষার্থীর চিন্তার গভীরতাকে আরো সুদৃঢ় করে তোলে। সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়কে একীভূত করে সে বিষয়গুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ, সহজীকরণ, গ্রহণযোগ্যতা যাচাই সম্পর্কে যে ধারণা লাভ সম্ভব, তা কেবল পাঠ্যক্রম ও নৈতিকতা শিক্ষার মাঝে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে সম্ভব। এভাবে নৈতিকতাসম্পন্ন একজন মানুষ আত্মবিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

****সুপারিশকৃত পদক্ষেপ:**

১. দেশর সকল প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের লালন, শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ প্রদান ও চর্চাকে উৎসাহিতকরণ ইত্যাদিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে এবং দৈনন্দিন কাজ কর্মে সেগুলোর প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

২. নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইন বিভাগসহ উচ্চ শিক্ষার প্রতিটি স্তরের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৩. শুধু দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি নয়, সুস্থবোধ সম্পন্ন এবং উচ্চ নৈতিকতা সমৃদ্ধ একটি জনগোষ্ঠী তৈরির লক্ষ্যে দেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

৪. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কারিকুলামে আইন-আদালত ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণামূলক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উক্ত পাঠ্যসূচিতে দেশের আইন-আদালত, বিচার ব্যবস্থা, আইন মান্যকরণে উদ্বুদ্ধকরণ, আইন মেনে চলার সুফল, আইন মেনে না চলার কুফল, আইন লংঘনের শাস্তি ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত থাকবে।

৫. শিশু কিশোরদের মধ্যে নৈতিক ও উন্নত সামাজিক মূল্যবোধ ভিত্তিক বাস্তব আচরণ কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে। প্রত্যেক শিশু যাতে নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং নিজ নিজ ধর্মের চর্চার প্রতি আগ্রহী হয় তার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

৬. আইনজীবী, বিচারক এবং সরকারি কর্মচারিদের মানসিকতায় নৈতিকতা ও উন্নত মূল্যবোধের সৃষ্টি এবং তাদের আচরণে ও কার্যকলাপে সেগুলোর চর্চা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৭. নৈতিকতা ও উন্নত মূল্যবোধভিত্তিক আচরণের বিস্তৃতির মাধ্যমে সমাজে এমন একটি সংস্কৃতি নির্মাণ করতে হবে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইন অনুসরণের সহায়ক এবং আইন লংঘন বা অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধক হবে। ফলে মামলা-মোকদ্দমা হবে ব্যতিক্রমী ঘটনা মাত্র।